সা'দত হাসান মান্টো

সেই মেয়েটি

সা'দত হাসান মাণ্টো

সেই মেয়েটি

অনুবাদঃ আখতার-উন-নবী

বুক সোসাইটি

৩৮/বাংলাবাজার/ঢাকা

প্রথম সংস্করণ ঃ আগষ্ট, ১৯৭৯

মূল্য ঃ ১০·০০ টাকা

প্রকাশনায় ঃ
দেওয়ান আবদুল কাদের । ৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা
মুদ্রণে ঃ
আবুল হাশেম । সোসাইটি প্রিন্টার্স । ৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা
প্রচ্ছদ-শিল্পী ঃ
প্রাণেশ কুমার মণ্ডল

জীবন-শিল্পী
আবদুল মান্নান সৈয়দকে

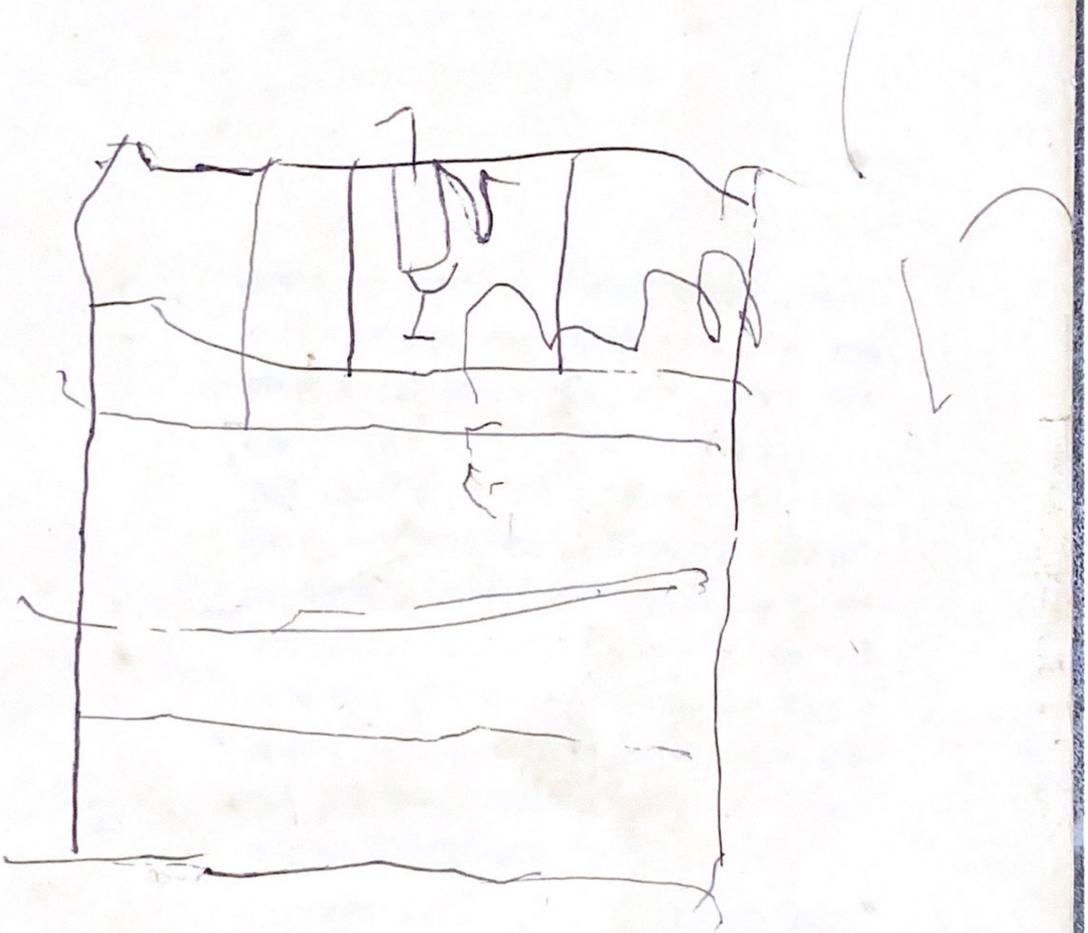

মাণ্টোর গল্প অনুবাদ করা খুবই মুশকিল। কারণ মাণ্টো বাংলাদেশে এতো জনপ্রিয় যে, তার প্রায় অধিকাংশ গল্পই অনুবাদ করা হয়ে গেছে। ফলে তাঁর অননূদিত গল্প খুঁজে পাওয়াই এক সমস্যা।

‘সেই মেয়েটি’র সব গল্পই সাম্প্রতিক কালের অনুবাদ করা। স্রেফ ‘বাই বাই’ (প্রকাশ কাল ঃ চিত্রালী, ৩রা এপ্রিল, ১৯৭০ সাল) গল্পটি ১৯৬৯ সালের শেষদিকে অনুবাদ করেছিলাম। অনেকদিন পর গল্পটি উদ্ধার করে ‘সেই মেয়েটি’ গল্প সংকলনে অন্তর্ভুক্ত করেছি। এ ছাড়া এ গ্রন্থের অন্যান্য গল্পগুলো ইতিপূর্বে কেউ অনুবাদ করলেও, কোন গল্প সংকলনে স্থান পায়নি বলেই আমার ধারণা।

আরামবাগ, ৯৯ **আখতার-উন-নবী**
ঢাকা

সূচীপত্র

সেই মেয়েটি ৯
মিস মালা ১৫
মিস টিনওয়ালা ২৩
উৎসাহ উদ্দীপনা ৩৩
নবাব সলিমুল্লাহ খান ৪১
পাঁচ দিন ৫০
বোকা ৬১
বাই বাই ৭১
পসারিণী ৭৭
একখানি পত্র ৮৫
মুতরী ৯৭
পটভূমি ৯৯

সেই মেয়েটি

সোয়া চারটা বেজে গেছে। কিন্তু রোদের তেজ ঠিক দুপুর বারোটার মতোই কড়া। সে বেলকনিতে এসে বাইরে তাকিয়ে দেখলো, একটি মেয়ে রোদের হাত থেকে বাঁচার জন্য একটি ছায়াদার বৃক্ষের নীচে বড় শ্লথ ভঙ্গীতে বসে আছে।

মেয়েটির গায়ের রঙ গাঢ় শ্যামলা। এতো গাঢ় যে, দেখতে তাকে বৃক্ষের ছায়ারই একটি অংশ মনে হয়। সুরেন্দ্র মেয়েটিকে দেখেই কাছে টানার জন্য তীব্র আকর্ষণ অনুভব করলো। অথচ এই গরমের মধ্যে কাউকে কাছে আকর্ষণ করার মতো বাসনা তার না থাকারই কথা।

সময়টা বড় বাজে। প্রচণ্ড গরম। সোয়া চারটা বেজে গেছে। সূর্য অস্ত যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। কিন্তু সময়টা বড়ই বাজে। দরদর করে ঘাম ছুটছে সারা শরীর থেকে। খোদা জানে লোমকূপ দিয়ে এতো পানি কোথা থেকে ছুটে বেরুচ্ছে।

সুরেন্দ্র বেশ ক'বার গভীরভাবে চিন্তা করে দেখলো, পানি সে বড় জোর চার ঘণ্টার মধ্যে স্রেফ এক গ্লাস পান করেছে। কিন্তু ঘাম কম করে হলেও চার গ্লাস বেরিয়েছে। তা এতো ঘাম কোথা থেকে এলো ?

সে মেয়েটিকে এভাবে গাছের ছায়ায় গুটিসুটি মেরে বসে থাকতে দেখে ভাবলো, পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী সুখী এই মেয়েটিই—যে কিনা প্রচণ্ড রোদ আর বিশ্রী ঋতুকে থোড়াই পরওয়া করে।

সুরেন্দ্র ঘামে ভিজে একেবারে লতপত হয়ে গেছে। গেঞ্জিটাও তার ঘামে ভিজে শরীরের সাথে লেপ্টে আছে। তার কাছে মনে হলো যেন কেউ তার সারা শরীরে মোবিল অয়েল ঢেলে দিয়েছে। কিন্তু এর পরও সে যখন ছায়াদার বৃক্ষের নীচে বসে থাকা মেয়েটিকে দেখলো তখন তার বড় ইচ্ছে হলো মেয়েটির ঘামে ভেজা শরীরের

সাথে মিলে-মিশে একাকার হয়ে যায়। ওর লোমকূপের ভেতরে ঢুকে পড়ে।

আকাশটা ছাই রঙা হয়ে আছে। কেউই নিশ্চিত করে বলতে পারে না, ওগুলো মেঘ না কুয়াশাচ্ছন্নতা। তা সেই কুয়াশাচ্ছন্নতা কিম্বা মেঘ থাকা সত্ত্বেও আকাশে রোদের উজ্জ্বলতার কিছু কমতি নেই। এবং সেই মেয়েটি পরম নিশ্চিন্তে গাছের ছায়ায় বসে বিশ্রাম নিচ্ছে।

সুরেন্দ্র আবারো গভীর মনোযোগ দিয়ে মেয়েটির দিকে তাকালো। তার গায়ের রঙ গাঢ় শ্যামলা। কিন্তু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো বড়ই তীক্ষ্ণ। এতো তীক্ষ্ণ যে সুরেন্দ্রের চোখের বাণে বেশ ক'বার বিদ্ধ হলো সে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।

পেশায় মেয়েটি বোধ হয় মজদুরনী। কিম্বা ভিখিরিণীও হতে পারে। সুরেন্দ্র তার সম্পর্কে ঠিক কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারলো না। আসলে সে মনে মনে ঠিক করছিলো, মেয়েটিকে ইশারা করবে কি করবে না।

ঘরে সে সম্পূর্ণ একা। তার বোন মারী গেছে। মাও গেছে তার সাথে। বাবা পরলোক গমন করেছে। একটা ছোট ভাই আছে, সে বোর্ডিংয়ে থাকে। সুরেন্দ্রের বয়েস সাতাশ-আটাশের কাছাকাছি হবে। ইতিপূর্বে সে তাদের আধবয়সী ঝি দু'টোর সাথে দু'তিনবার কাজ করে শেষ করেছে।

কে জানে কেন, তবে বিশ্রী ঋতু হওয়া সত্ত্বেও সুরেন্দ্রের কেন যেন শুধু ইচ্ছে করছিলো গাছের ছায়ায় বসে থাকা মেয়েটির কাছে যেতে, কিম্বা উপর থেকেই তাকে ইশারা করতে। যাতে সে সুরেন্দ্রের কাছে চলে আসে, এবং দু'জন পরস্পরের ঘামের ভেতর ডুবে গিয়ে কোন এক অজানা দ্বীপে পৌঁছে যেতে পারে।

সুরেন্দ্র বেলকনির উপর কাঠের রেলিংয়ের কাছে দাঁড়িয়ে জোরে গলা খাঁকারি দিলো। কিন্তু তবু মেয়েটির মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারলো না। এরকম বার কয়েক গলা খাঁকারি দেয়ার পরও যখন কোন ফলোদয় হলো না, তখন সুরেন্দ্র কথা বলে উঠলো, 'আরে

ভাই, একটু এদিকে তো তাকাও।'

কিন্তু তবুও মেয়েটি তার দিকে তাকালো না। বসে বসে নিজের পায়ের গোছা চুলকাতে লাগলো।

সুরেন্দ্র মহা সমস্যায় পড়লো। মেয়ে না হয়ে যদি কোন কুকুর হতো, তাহলে নিশ্চয়ই তার আওয়াজ শুনে তার দিকে তাকাতো। যদি আওয়াজটা তার পছন্দ নাও হতো অন্ততঃ ঘেউ ঘেউ হলেও করতো। কিন্তু এই মেয়েটি যেন তার আওয়াজ শুনেইনি। কিম্বা শুনেও না শোনার ভান করে আছে।

সুরেন্দ্র মনে মনে বড় লজ্জিত হলো। এবার জোরে মেয়েটিকে ডাক দিলো, 'এই মেয়ে!'

এরপরও মেয়েটি তার দিকে তাকালো না। তখন আপন মনে গজ গজ করতে করতে মখমলের জামাটা পরে নীচে নেমে এলো সুরেন্দ্র। এবং মেয়েটির কাছে এসে পৌঁছলো। মেয়েটি তখনো নিজের নগ্ন পায়ের গোছা চুলকাতেই ব্যস্ত।

সুরেন্দ্র ওর কাছে দাঁড়িয়ে গেলো। মেয়েটি একবারের জন্য চোখ তুলে সুরেন্দ্রের দিকে তাকালো এবং সেলোয়ার নামিয়ে নগ্ন পায়ের গোছা ঢেকে ফেললো।

সুরেন্দ্র তাকে জিজ্ঞেস করলো, 'এখানে কি করছো তুমি?'

মেয়েটি জবাব দিলো, 'বসে আছি।'

'কেন বসে আছো?'

মেয়েটি উঠে দাঁড়িয়ে পড়লো, 'নাও, এবার দাঁড়িয়ে গেলাম।'

সুরেন্দ্র অপ্রস্তুত হয়ে গেলো। 'তাতে কি হবে, জিজ্ঞেস করছিলাম এতোক্ষণ ধরে তুমি এখানে বসে বসে কি করছো?'

মেয়েটির চেহারা আরো কালো হয়ে গেলো, 'কি চাও তুমি?'

বেশ কিছুক্ষণ সুরেন্দ্র নিজের নিঃসঙ্গ হৃদয়টা হাতড়ে বেড়ালো, 'আমি কি চাব? আমি কিছুই চাই না—আমি ঘরে বড় একা। যদি তুমি আমার সঙ্গে এসো তাহলে বড় দয়া হয়।'

মেয়েটির গাঢ় শ্যামলা এক জোড়া ঠোঁটে এক অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠলো, 'দয়া—কিসের দয়া—চলো।'

দু'জন হাঁটতে শুরু করলো।

উপরে পোঁছে মেয়েটি সোফার পরিবর্তে মেঝেতে বসে পড়লো এবং পায়ের গোছা চুলকাতে লাগলো। সুরেন্দ্র মেয়েটির পাশে দাঁড়িয়ে ভাবছিলো, এখন কি করা যায়।

সে মেয়েটিকে গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখলো। খুব একটা সুন্দরী নয় সে। কিন্তু একটি যুবতী মেয়ের মধ্যে যৌবনের উপকরণ যা যা থাকার দরকার, তার সবই তার মধ্যে আছে। তার কাপড়-চোপড় ময়লা, কিন্তু এরপরও তার শক্ত সমর্থ, যৌবনপুষ্ট শরীর কাপড়ের ওপর দিয়ে উঁকি মারছে।

সুরেন্দ্র বললো, 'ওখানে কেন বসেছো? এখানে সোফায় বসো।'

জবাবে মেয়েটি শুধু বললো, 'না।'

সুরেন্দ্র মেয়েটির পাশে মেঝেতেই বসে পড়লো। 'তোমার খুশী! নাও এবার বলো—তুমি কে এবং গাছের নীচে এতোক্ষণ ধরে কেন বসে ছিলে?'

'আমি কে এবং গাছের নীচে কেন বসে আছি—তা দিয়ে তোমার কোন কাজ নেই।' এ কথা বলেই মেয়েটি সেলোয়ার দিয়ে পায়ের গোছা ঢেকে ফেললো এবং চুলকানি বন্ধ করে দিলো।

সুরেন্দ্র মেয়েটির ভরা যৌবনের কথা ভাবছে। মেয়েটির সাথে সেই আধবয়সী ঝি দু'টোর তুলনা করে দেখছে—যাদের সাথে ইতিমধ্যেই সুরেন্দ্র দু'তিনবার দেহ-সংযোগ সাঙ্গ করেছে। তার কাছে মনে হলো, মেয়েটির তুলনায় ঝি দু'টো অনেক ঢিলা-ঢালা, শ্লথ, যেন বহু বছরের ব্যবহৃত নড়বড়ে একখানা সাইকেল। কিন্তু এটির কলকব্জা আপন আপন জায়গায় বড় টাইট, আঁটসাঁট।

আধবয়সী ঝি দু'টোর ব্যাপারে সুরেন্দ্রকে তেমন কোন চেষ্টা তদবীর করতে হয়নি। ওরাই সুরেন্দ্রকে বরং জোর করে তাদের কুঠুরীতে ধরে নিয়ে যেতো। কিন্তু এখন সে বুঝতে পারছে, এই মেয়েটির সাথে সম্পর্ক চালু করতে হলে তাকেই উদ্যোগ নিতে হবে। অথচ এর জন্য যে টেকনিক জানা প্রয়োজন তার কিছুই সে জানে না। তবুও সুরেন্দ্র একখানা হাত দিয়ে ফুলের মালার মতো মেয়েটির কোমর ধরলো।

'কি করছো তুমি ?'

সুরেন্দ্র আবারো অপ্রস্তুত হয়ে গেলো, 'আমি……আমি…… কিছু না।'

মেয়েটির গাঢ় শ্যামল একজোড়া ঠোঁটে এক আজব ধরনের হাসি ফুটে ওঠলো, 'আরামসে বসে থাকো।'

সুরেন্দ্র আরামসে বসে থাকলো। কিন্তু তার বুকের ভেতরের তোলপাড় ক্রমশঃ বাড়তে লাগলো। অতএব সাহস সঞ্চয় করে সে মেয়েটিকে বুকের সাথে জড়িয়ে ফেললো।

মেয়েটি খুব হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি করলো, কিন্তু সুরেন্দ্রের শক্ত বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারলো না। মেঝেতে চিৎ হয়ে গড়িয়ে পড়লো সে, আর সুরেন্দ্র তার বুকের ওপর চড়ে বসলো। এবং চটাচট মেয়েটির শ্যামলা একজোড়া ঠোঁটে গাঢ় চুম্বন রেখা এঁকে দিতে থাকলো।

মেয়েটির শরীরে শক্তি কম। সুরেন্দ্রের ভারী শরীর তুলে একদিকে ছুঁড়ে ফেলার সামর্থ্যও তার নেই। তাই অপারগ হয়ে তার ভারী শরীর আর ভেজা চুমু সহ্য করতে থাকলো মেয়েটি।

সুরেন্দ্র বুঝতে পারলো মেয়েটি বশীভূত হয়েছে। সুতরাং সে আরেক ধাপ এগিয়ে গিয়ে তার সারা শরীর হাতড়ে বেড়াতে শুরু করলো। তার কামিজের ভেতর হাত চালিয়ে দিলো। মেয়েটি চুপ করে গেলো, হাত-পা ছোঁড়া বন্ধ করে দিলো। সম্ভবতঃ বাধা দেয়াটা নিরর্থক মনে করছে সে।

সুরেন্দ্র এবার স্থির নিশ্চিত যে, ময়দান তার হাতেই, সুতরাং জোরাজুরি ছেড়ে দিলো সে। এবং মেয়েটিকে বললো, 'এসো, পালঙ্কে শুয়ে পড়ি।'

মেয়েটি উঠলো এবং সুরেন্দ্রের সাথে গিয়ে পালঙ্কের ওপর শুয়ে পড়লো।

পালঙ্কের পাশেই তেপায়ার ওপর একখানা ছোট প্লেটে কিছু মাল্টা আর একখানা ধারালো ছুরি পড়ে ছিলো। মেয়েটি একটি মাল্টা হাতে নিয়ে সুরেন্দ্রকে জিজ্ঞেস করলো, 'আমি খাই ?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ—একটা কেন, সবগুলোই খেয়ে ফেলো।'

সুরেন্দ্র ছুরি হাতে নিয়ে মাল্টা ছিলতে শুরু করলো। কিন্তু মেয়েটি তার কাছ থেকে মাল্টা আর ছুরি দু'টোই নিয়ে নিলো।

'আমি নিজেই ছিলবো।'

মেয়েটি বড় সুন্দরভাবে মাল্টা ছিলে ওপরের খোসা ছাড়ালো। তারপর ওপরের পাতলা ছিলকা সরিয়ে আলাদা আলাদা টুকরো করলো। এক টুকরো সুরেন্দ্রকে দিলো এবং এক টুকরো নিজে মুখে পুরে স্বাদ উপভোগ করতে করতে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার কাছে পিস্তল আছে?'

সুরেন্দ্র জবাব দিলো, 'হ্যাঁ—, কিন্তু তা দিয়ে তুমি কি করবে?'

মেয়েটির শ্যামলা একজোড়া ঠোঁটে আবারো সেই আজব হাসি ফুটে ওঠলো, 'এমনি জিজ্ঞেস করলাম আর কি। জানোই তো আজকাল হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা চলছে।'

সুরেন্দ্র আরেকটি মাল্টা তুলে নিলো প্লেট থেকে। 'তা কি আজ থেকে চলছে? অনেকদিন থেকে চলছে। আমি নিজের পিস্তল দিয়ে চার চারটা মুসলমান মেরেছি!'……

'সত্যি?' বলেই মেয়েটি উঠে দাঁড়ালো, 'আমাকে একটু দেখাও না সেই পিস্তলটা!'

সুরেন্দ্র উঠলো। পাশের কামরায় গিয়ে টেবিলের ড্রয়ার খুললো এবং পিস্তল নিয়ে বেরিয়ে এলো। 'এই নাও, কিন্তু দাঁড়াও!' সুরেন্দ্র পিস্তলের সেফ্‌টি কেস ঠিক করে দিলো। কারণ ওর ভেতরে গুলী ভরা ছিলো।

মেয়েটি পিস্তল হাতে নিয়ে সুরেন্দ্রকে বললো, 'আমিও আজ একজন মুসলমানকে মারবো।' এ কথা বলেই সে সেফ্‌টি কেস ঘুরিয়ে সুরেন্দ্রের ওপর তাক করে ট্রিগার টিপে দিলো।—সুরেন্দ্র মেঝেতে লুটিয়ে পড়লো এবং রক্তাক্ত অবস্থায় কঁকাতে লাগলো, 'এ তুমি কি করলে?'

মেয়েটির গাঢ় শ্যামলা এক জোড়া ঠোঁটে এক অদ্ভুত হাসি ফুটে ওঠলো, 'সেই যে চারজন মুসলমান তুমি মেরেছো, তার মধ্যে আমার বাবাও ছিলো!'

মিস মালা

গীতিকার আজিম গোবিন্দপুরী এ. বি. সি. প্রডাকশন্সে চাকুরী নেয়ার পরই তার বন্ধু সঙ্গীত পরিচালক ভট্টাচার্যের কথা চিন্তা করলো। ভট্টাচার্য মারাঠী। আজিমের সাথে কয়েকটি ছবিতে কাজ করেছে। আজিম তার কর্মক্ষমতা সম্পর্কে ওয়াকেবহাল। ষ্ট্যাণ্ট ফিল্মে মানুষ কি এমন নৈপুণ্য দেখাতে পারে! বেচারা এতোদিন অখ্যাতির অতলেই হারিয়ে ছিলো।

আজিম অতঃপর শেঠের সঙ্গে কথাবার্তা ঠিক করে নিলো। তারপর ভট্টাচার্যকে ডেকে তিন হাজার টাকার বিনিময়ে একটা ছবির কনট্রাক্ট করে দিলো। কনট্রাক্টের ওপর দস্তখত করেই পাঁচশ টাকা অগ্রিম পেলো সে। ও টাকা দিয়েই হাওলাত-কর্জ শোধ করলো। আজিম গোবিন্দপুরীর প্রতি সে এজন্য বড়ই কৃতজ্ঞ। তার বড় ইচ্ছে হলো আজিমের জন্য কিছু একটা করে। কিন্তু পরে সে ভাবলো, লোকটা বড়ই ভদ্র নিঃস্বার্থ। ঠিক আছে কোন অসুবিধে নেই, আগামী মাসে হবে। কেননা চুক্তি মোতাবেক প্রতিমাসে পাঁচশ টাকা করে পাবে সে। আজিমকে সে কিছুই বললো না। দু'জনেই যার যার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

আজিম দশটা গান লিখলো। তা থেকে চারটা গান পছন্দ করলো শেঠ। ভট্টাচার্য আজিমের সাথে একত্রে বসে সেখান থেকে দু'টোর সুর সংযোজন করলো—যেগুলো সবাই বেশ পছন্দ করলো।

পনের-বিশ দিন শুধু রিহার্সালই চললো। ছবির প্রথম গান কোরাস। তার জন্য কমসে কম দশটা কণ্ঠশিল্পীর প্রয়োজন। প্রডাকশন ম্যানেজারকে বলে দেয়া হয়েছে। কিন্তু প্রডাকশন ম্যানেজার কণ্ঠশিল্পী যোগাড় করতে ব্যর্থ হলে ভট্টাচার্য মিস মালাকেই ডাকলো। মালার গলা খুবই ভালো। তাছাড়া সে নিজে আরো পাঁচ-ছ'জন শিল্পীকে চেনে যারা সুরের সাথে গলা মিলিয়ে বেশ ভালোই গান গায়।

মিস মালা খাণ্ডেকর, নামেই বুঝা যায় কুলহাপুরের মারাঠী। অন্যান্যদের তুলনায় তার উর্দু উচ্চারণ বেশ স্পষ্ট। উর্দু ভাষায় কথা বলার সখ তার বেজায়। বয়েস খুব বেশী নয়, কিন্তু চেহারা-সুরতে বড় পরিণত মনে হয়। কথাবার্তাও এমনভাবে বলে, মনে হয় যেন মেয়েটির বেশ বয়েস হয়েছে। জীবনের চড়াই-উতড়াই সম্পর্কে অনবহিত নয়। ষ্টুডিওর সবাইকে ভাইজান বলে সম্বোধন করে এবং পরিচিত অপরিচিত সবাইর সাথে সহসা ভাব জমিয়ে ফেলতে পারে।

ভট্টাচার্য তাকে ডাকতেই সে খুব খুশী হলো। তার ওপর ভার দেয়া হলো, সে যেন অতি সত্বর কোরাস গাওয়ার জন্য দশটা মেয়ে যোগাড় করে দেয়। মিস মালা পরদিনই বারোটি মেয়েকে এনে হাজির করলো। ভট্টাচার্য তাদের মধ্য থেকে টেষ্ট নিয়ে সাতজনকে বাছাই করলো। বাকী মেয়েদের বিদায় করে দিলো। এবং মনে মনে ভাবলো, ঠিক আছে, সাতজনই সই। জগতাপ সাউণ্ড রেকর্ডিষ্টের সাথেও আলাপ করে নিলো সে। জগতাপ বললো, 'আমি সব ঠিক করে নেব। এমনভাবে রেকর্ডিং করবো যে, মানুষ মনে করবে বুঝি বিশটা মেয়ে গাইছে।'

জগতাপ নিজের কাজ খুব ভালো বুঝে। কাজেই রেকর্ডিংয়ের জন্য সে যন্ত্রীদল আর কণ্ঠশিল্পীদের সাউণ্ড প্রুফ কামরার পরিবর্তে এমন এক জায়গায় বসালো—যার দেয়ালগুলো বেশ শক্ত, এবং ওপরেও নেই কোন আচ্ছাদনী যা কিনা আওয়াজকে ভারী করে। 'বেওয়াফা' ছবির মহরতও সেই কোরাসের মাধ্যমেই সম্পন্ন হলো। অনেক লোক এসেছে। তাদের মধ্যে বড় বড় ফিল্মী শেঠ আর নামকরা পরিবেশকও আছে। এ. বি. সি. প্রডাকশন্স-এর মালিক বেশ জমকালো অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে।

প্রথম দু'চারবার গানের রিহার্সাল হলো। মিস মালা খাণ্ডেকর ভট্টাচার্যকে এ ব্যাপারে বেশ সহযোগিতা করেছে। সাতটি মেয়েকেই পৃথক পৃথক ভাবে সাবধান করে দিয়েছে, যেন কোন গণ্ডগোল না হয়। ভট্টাচার্য প্রথম রিহার্সালেই বেশ সন্তুষ্ট হলো। কিন্তু তবুও নিশ্চিন্ত হবার জন্য আরো কয়েকবার রিহার্সাল করলো। তারপর

জগতাপকে নিশ্চিন্ত হবার জন্য বললো। জগতাপ কানে হেডফোন লাগিয়ে প্রথমবার সাউণ্ড ট্রাকের ভেতর দিয়ে কোরাসটা শুনেই খুশী হলো। এবং উচ্চস্বরে 'ও. কে.' বলে দিলো। সব যন্ত্রপাতি যথাযথ জায়গায় ফিট করা হয়েছে।

নিমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য মাইক্রোফেনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। রেকর্ডিং শুরু হতেই সুইচ অন করে দেয়া হলো। তারপর ভট্টাচার্যের কণ্ঠস্বর শোনা গেলো, 'সং নম্বর ওয়ান, টেক ফাষ্ট, রেডী ওয়ান, টু—'

তারপর কোরাস শুরু হলো।

খুব ভালো কম্পোজিশন ছিলো। সাতটি মেয়ের মধ্যে কেউ-ই সুর ভুল করেনি। অতিথিরা খুবই খুশী হলো। সুরকারের সাথে শেঠের ধরতে গেলে তেমন পরিচয়ই নেই, সেই শেঠও খুশী। কারণ অতিথিরা কোরাসটার বেশ প্রশংসা করছিলো। ভট্টাচার্য বিভিন্ন যন্ত্রীদল আর কণ্ঠশিল্পীদের প্রশংসা করলো। বিশেষ করে মিস মালার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানালো, যে কিনা খুব কম সময়ের মধ্যে এতোগুলো কণ্ঠ যোগাড় করে দিয়েছে। তারপর ভট্টাচার্য সাউণ্ড রেকর্ডিষ্ট জগতাপের সাথে কোলাকুলি করতে যাবে, এ সময় এ. বি. সি. প্রডাকশন্সের মালিক শেঠ রনছুর দাশের লোক এসে জানালো যে, শেঠ তাকে আর আজিম গোবিন্দপুরীকে ডাকছে।

দু'জন ছুটে গেলো শেঠের কাছে। ষ্টুডিওর ও মাথায় অনুষ্ঠান তখনো বেশ সরগরম। শেঠ সাহেব অতিথিদের সামনেই একশ' টাকার সবুজ নোট পুরস্কার হিসেবে প্রথমে ভট্টাচার্যকে দিলো। তারপর দ্বিতীয়টা আজিম গোবিন্দপুরীকে। ষ্টুডিওর ছোট্ট বাগানটা—যেখানে অতিথিরা বসে ছিলো—একরাশ হাততালিতে মুখরিত হয়ে উঠলো।

মহরত অনুষ্ঠান শেষ হলে ভট্টাচার্য আজিমকে বললো, 'মালপানি তো আছেই, চলো আউটডোরে যাই।'

আজিম কথাটা বুঝতে পারলো না, 'আউটডোর কোথায় ?'

ভট্টাচার্য হাসলো, 'আরে কচি খোকা, মৌজ ফুর্তি করতে যাবো। একশ' টাকা তোমার কাছে আছে, একশ' টাকা আমার কাছে, চলো।'

আজিম বুঝতে পেরেছে। কিন্তু সে এসব মৌজ ফুর্তিকে বড় ভয়

করে। তার স্ত্রী আছে, ছোট ছোট দু'টো বাচ্চাও আছে। সে কোনদিন এসব আমোদ-ফুর্তি করেনি। কিন্তু আজ সে খুবই খুশী। তাই মনে মনে বললো, 'চল, দেখি না কি হয়।'

ভট্টাচার্য তৎক্ষণাৎ ট্যাক্সী আনিয়ে তাতে চড়ে বসলো। এবং দু'জনে গ্রাণ্ট রোডে পৌঁছলো। আজিম জিজ্ঞেস করলো, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি ভট্টাচার্য?'

ভট্টাচার্য হাসলো, 'খুব আপন জনের ঘরে যাচ্ছি।'

তার খুব আপন জনের ঘরটা আর কারোর নয়, মিস মালারই ঘর। মালা বড় আন্তরিকতার সাথে তাদের সাদর সম্ভাষণ জানালো। নিজের খাস কামরায় নিয়ে গিয়ে বসালো। হোটেল থেকে চা এনে খাওয়ালো। চা খাওয়ার পর ভট্টাচার্য মিস মালাকে বললো, 'আমরা একটু আমোদ-ফুর্তি করতে বেরিয়েছি। তুমি আমাদের জন্য কিছু ব্যবস্থা করে দাও।'

মালা বুঝতে পেরেছে। সে এমনিতেই ভট্টাচার্যের প্রতি কৃতজ্ঞ। এজন্যে সে তাড়াতাড়ি মারাঠী ভাষায় বলে উঠলো, 'আমি সব সময় আপনাদের খেদমত করার জন্য তৈরী।'

আসলে ভট্টাচার্য আজিমকে খুশী করতে চায়। কারণ সে তাকে চাকুরী পাইয়ে দিয়েছে। অতএব ভট্টাচার্য মিস মালাকে বললো যেন সে একটা মেয়ের ব্যবস্থা করে দেয়।

মিস মালা তাড়াতাড়ি মেক-আপ ঠিক করে তৈরী হয়ে নিলো। এবং সবাই ট্যাক্সীতে গিয়ে বসলো। প্রথমে মালা প্লে-ব্যাক সিঙ্গার শান্তা করনাকিরণের বাসায় এলো। কিন্তু সে অন্য একজনের সঙ্গে বাইরে চলে গেছে। পরে সে অনুসূয়ার ওখানে এলো। কিন্তু সে এসব কাজে যাওয়ার ঠিক উপযুক্ত নয়।

মিস মালা বড় দুঃখিত হলো। দু'জায়গায় হতাশ হয়ে ফিরে আসতে হয়েছে বলে তার অনুশোচনার অন্ত নেই। তবে সে আশা ছাড়েনি, ব্যবস্থা একটা হয়ে যাবেই। ট্যাক্সী এবার গোলপট্টির দিকে ছুটে চললো। ওখানে কৃষ্ণা থাকে। পনের-ষোল বছরের যুবতী কৃষ্ণা গুজরাটী মেয়ে। বড় কোমল আর দরদী সুরে গান গায়। মাল

তার বাসায় গিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে বেরিয়ে এলো। ভট্টাচার্যকে হাত জোড় করে নমস্কার জানালো কৃষ্ণা। আজিমকেও। মালা পাকা দালালের মতো আজিমকে চোখ টিপে ইশারা করলো, যেন নীরবে জানিয়ে দিলো, 'ও আপনার জন্যই।'

ভট্টাচার্যও চোখে চোখে যেন সমর্থন জানালো। কৃষ্ণা আজিম গোবিন্দপুরীর পাশে বসে পড়লো। যেহেতু মিস মালা তাকে পুরো ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়েছে, সুতরাং কৃষ্ণা তার সাথে খোস-আনন্দে মেতে উঠলো। আজিম মেয়েদের মতো কিছুটা দ্বিধা-সঙ্কোচ, কিছুটা লজ্জা অনুভব করতে লাগলো। ভট্টাচার্য তার মন-মানসিকতার সাথে পরিচিত ছিলো। এজন্যে সে একটি পার্কের সামনে ট্যাক্সী দাঁড় করালো। এবং স্রেফ আজিমকে সাথে নিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলো।

গীতিকার ইতিপূর্বে দু'একবার মাত্র পান করেছিলো। তাও নিছক ব্যবসার খাতিরে। এখন ভট্টাচার্যের পীড়াপীড়িতে দু'পেগ পান করলো এবং দু'পেগেই তার নেশা ধরে গেছে। ভট্টাচার্য একটা বোতল খরিদ করে সঙ্গে নিয়ে নিলো। এখন তারা আবার ট্যাক্সীতে গিয়ে বসলো।

আজিম ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি যে, তার বন্ধু ভট্টাচার্য সঙ্গে করে আরো দু'টো গ্লাস আর সোডার বোতল নিয়ে রেখেছে।

আজিম পরে জানতে পারলো যে, ভট্টাচার্য কৃষ্ণার মাকে বলে এসেছে, দিনে যে কোরাস গানটার রেকর্ডিং হয়েছিলো, তার সবগুলো টেক নষ্ট হয়ে গেছে। এজন্যে রাতে আবারো গানটার রেকর্ডিং হবে। কৃষ্ণার মা এমনি তাকে বাইরে যাবার অনুমতি দিতো না। কিন্তু কৃষ্ণা এর জন্যে আরো টাকা পাবে শুনেই সে মেয়েকে বাইরে যাবার অনুমতি দিয়েছে। মেয়েকে বললো, 'তাড়াতাড়ি যাও এবং কাজ শেষ করে সোজা বাড়ী চলে এসো। ওখানে আবার বসে থেকো না যেন।'

ট্যাক্সী বালি এসে পৌঁছলো। অর্থাৎ সমুদ্র সৈকতের কাছে। এটা হচ্ছে সেই জায়গা যেখানে আমোদ-ফুর্তি করার জন্য মানুষ মেয়ে বগলদাবা করে চলে আসে। একটা পাহাড় আছে, কৃত্রিম পাহাড় না প্রকৃতি প্রদত্ত বলা মুশকিল। সে পাহাড়ের ওপর উঠলেই বুঝা যায়,

জায়গাটা বেশ উঁচু আর প্রশস্ত।

তার ওপর বেশ দূরত্ব বজায় রেখে কিছু বেঞ্চি পাতা আছে। প্রত্যেক বেঞ্চিতে স্রেফ এক এক জোড়া করে বসে। তাদের মধ্যে একটা অলিখিত চুক্তি থাকে যে, ওরা কেউ কারো ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না। ভট্টাচার্য যেহেতু আজিমকে খুশী করতে চাচ্ছে, সুতরাং সেই পাহাড়ের ওপর কৃষ্ণাকে তার হাতে তুলে দিয়ে নিজে মিস মালাকে নিয়ে টলতে টলতে অন্যদিকে চলে গেলো।

আজিম আর ভট্টাচার্যের মাঝখানে দেড়শ' গজের ব্যবধান হবে। আজিম যে কিনা ইতিপূর্বে অন্য মেয়ের কাছ থেকে নিজেকে সব সময় হাজার মাইল ব্যবধান মনে করে আসছে, এখন কৃষ্ণাকে নিজের শরীরের সাথে একেবারে লেগে থাকতে দেখে তার সে বিশ্বাস নড়বড়ে হয়ে উঠলো। কৃষ্ণা খাঁটি গুজরাটী মেয়ে। শ্যামলা লাবণ্যময়ী, বড় মজবুত শরীরের যুবতী। এবং তার যৌবনপুষ্ট দেহে সব রকমের আমন্ত্রণ বিগুমান, যা একজন ভালো খেলাড়ি মেয়ের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। নেশার ঘোরে আজিম তার স্ত্রীর কথা ভুলে গেছে। এখন তার একান্ত ইচ্ছে, কৃষ্ণাকে কিছুক্ষণের জন্য নিজের স্ত্রী বানিয়ে রাখে।

তার মাথায় বিভিন্ন রকমের দুষ্টুমী এসে ভিড় করতে থাকলো। তার কিছু রা'মের গুণে, কিছু কৃষ্ণার উষ্ণ সান্নিধ্যের গুণে। সাধারণত আজিম শান্ত প্রকৃতির, ধীর স্থির গভীর। বড় মিতবাক, কিন্তু এখন সে কৃষ্ণাকে আবেগের আতিশয্যে কাতুকুতু দিতে লাগলো। তাকে গোটা কয়েক চুটকি শুনালো জোড়াতালি দেয়া গুজরাটী ভাষায়। তারপর না জানি কি খেয়াল হলো, জোরে ভট্টাচার্যকে ডাক দিয়ে উঠলো, 'পুলিশ আসছে, পুলিশ আসছে।'

ভট্টাচার্য মালাকে সঙ্গে নিয়ে এলো এবং আজিমকে বেশ মোটা-সোটা একটা গালি দিলো. তারপর হাসতে লাগলো। সে বুঝে গেছে যে, আজিম তার সাথে ঠাট্টা করছে। পরে ভাবলো, তার চেয়ে কোন হোটেলে চলে যাওয়াই ভালো, পুলিশের হাঙ্গামা থেকে বাঁচা যাবে। চারজনই উঠতে যাবে, এ সময় পীলা পাগড়ীঅলা দেখা গেলো। সে কর্কশস্বরে সেপাইসুলভ ভঙ্গীতে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমরা রাত

এগারোটায় এখানে কি করছো? জানো না দশটার পর এখানে বসা নিষেধ।'

আজিম শান্ত্রীকে বললো, 'জনাব আমরা সবাই ফিল্মের লোক।'

'এই ছুকরীটা?' সে কৃষ্ণার দিকে তাকালো।

'এও ফিল্মে কাজ করে। আমরা কোন খারাপ মতলবে এখানে আসিনি। এই যে পাশের ষ্টুডিওতেই আমরা কাজ করি। কাজ করে ক্লান্ত হয়ে পড়লে এখানে চলে আসি, একটু আমোদ-ফুর্তি করি। বারোটায় আমাদের শূটিং আবার শুরু হবে।'

পীলা পাগড়ীঅলা নিশ্চিন্ত হলো। তারপর ভট্টাচার্যকে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি এখানে কেন বসে আছো?'

ভট্টাচার্য প্রথমটায় ঘাবড়ে গেলো। পরে নিজেকে সামলে নিয়ে মিস মালার হাত ধরে বললো, 'এ আমার ওয়াইফ। আমাদের ট্যাক্সী নীচে দাঁড়িয়ে আছে।'

আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর তারা নিষ্কৃতি পেলো। এবং চারজন নীচে ট্যাক্সীতে গিয়ে বসলো। তারপর চিন্তা করলো, কোন্ হোটেলে যাওয়া যায়? আজিমের পরিচিত তেমন কোন হোটেল নেই, যেখানে মেয়ে নিয়ে গিয়ে ঘণ্টা কয়েক আমোদ-ফুর্তি করা যায়। ভট্টাচার্য অনর্থক তার সাথে পরামর্শ করছে।

এ সময় ডিউক ইয়ার্ড কাশীদেব হোটেলের কথা মনে পড়ে গেলো ভট্টাচার্যের। তখনি ট্যাক্সীঅলাকে সেখানে যাবার নির্দেশ দিলো।

কাশীদেব হোটেলে দু'টো কামরা ভাড়া করলো ভট্টাচার্য। একটাতে চলে গেলো আজিম আর কৃষ্ণা, অন্যটাতে ভট্টাচার্য আর মিস মালা খাণ্ডেকর।

কৃষ্ণা স্বভাবতই 'আমন্ত্রণের প্রতিমা।' কিন্তু আজিম আরো দু'পেগ পান করার পর যেন দার্শনিক হয়ে গেলো। সে কৃষ্ণাকে গভীরভাবে দেখলো এবং ভাবলো, এতো কম বয়েসে মেয়েটি কেন পাপের পথ বেছে নিলো। রক্ত কম থাকা সত্ত্বেও মেয়েটির শরীরে এত্তো যৌনজ্বালা কেন! আর কতোদিন এই পাতলা কোমল মেয়েটি—যে মাংস খায় না—নিজের মাংস বিক্রি করতে থাকবে! মেয়েটির ওপর আজিমের বড়

করুণা হলো। অতএব সে উপদেশদাতার ভূমিকা গ্রহণ করে বলতে শুরু করলো, 'কৃষ্ণা, পাপের জীবন থেকে চলে এসো। এ পথে পা বাড়িও না আর। এ পথ তোমাকে এমন একটা ভয়ঙ্কর গর্তে নিয়ে ফেলবে যে, আর বেরুতে পারবে না। সতীত্ব বিক্রি করা সবচেয়ে খারাপ কাজ। আজকের এই রাতটা তোমার জীবনের সবচেয়ে উজ্জ্বল রাত মনে করবে। কারণ আজকের এই রাতেই আমি তোমাকে পাপপুণ্য বুঝিয়ে দিয়েছি।' কিন্তু কৃষ্ণা মনে করলো বুঝি আজিম তার সাথে প্রেম করছে। সুতরাং সে আজিমের শরীরে মিশে গেলো। আর আজিমও তার পাপপুণ্যের কথা বেমালুম ভুলে গেলো।

পরে আজিম বড় লজ্জিত হলো। কামরা থেকে বেরিয়েই দেখলো ভট্টাচার্য বারান্দায় পায়চারি করছে, দেখতে অনেকটা ভেড়ুয়াদের মতো। আজিমকে দেখেই সে থেমে গেলো। কৃষ্ণার সন্তুষ্টি মাখা চেহারার দিকে তাকিয়ে আরো জলে উঠে আজিমকে বললো, 'ওই শালী চলে গেছে।'

লজ্জার সাগরে নিমজ্জিত আজিম হঠাৎ চমকে উঠলো, 'কে?'

'ওই যে—মালা।'

'কেন?'

ভট্টাচার্যের কণ্ঠে এক অদ্ভুত আক্ষেপ ঝড়ে পড়ে, 'আমি তাকে অনেকক্ষণ ধরে চুমু খেলাম। তারপর যখন বললাম, এসো, তখন শালী বলতে লাগলো, তুমি আমার ভাই। আমি একজনকে বিয়ে করে ফেলেছি। তারপর সে চলে গেলো, কারণ সে শালা হয়তো এতোক্ষণে ঘরে ফিরে এসেছে।'

মিস টিনওয়ালা

সাদা জুতো জোড়া পালিশ করছিলাম। এ সময় স্ত্রী এসে বললো, 'জায়েদী সাহেব এসেছেন।'

আমি জুতো জোড়া স্ত্রীর হাতে দিয়ে দিলাম। তারপর হাত পরিকার করে পাশের কামরায় এলাম যেখানে জায়েদী বসে ছিলো। জায়েদীর দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে বললাম, 'আরে, কি হলো তোমার?'

জায়েদী চেহারায় প্রফুল্লতা ফিরিয়ে আনার ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে বললো, 'অসুখ ছিলো।'

আমি তার পাশে চেয়ারে বসে পড়লাম। 'অনেক শুকিয়ে গেছো দোস্ত। আমি তো প্রথমে চিনতেই পারিনি—কি অসুখ?'

'জানি না।'

'মানে?'

জায়েদী জিব দিয়ে শুকনো ঠোঁট জোড়া ভিজিয়ে বললো, 'রোগটা যে কি আমি নিজেও জানি না।'

'তার মানে তুমি এখনো অসুস্থ!'

'হ্যাঁ, অনেকটা তাই।'

'কোন ভালো ডাক্তারকে দেখাতে!'

জায়েদী চুপ করে রইলো।

আমি আবার তাকে বললাম, 'কোন ভালো ডাক্তারের পরামর্শ নিয়েছো?'

'না।'

'কেন?'

জায়েদী আবার চুপ করে থাকলো। জবাব দেয়ার পরিবর্তে পকেট থেকে সিগ্রেট কেস বের করলো। তার আঙ্গুল কাঁপছিলো।

'আমার মনে হয় তোমার নার্ভ সিসটেম খারাপ হয়ে গেছে।

ভিটামিন বি ইনজেকশন দাও। একদম ঠিক হয়ে যাবে। গত বছর অত্যধিক হুইস্কি পান করার দরুন আমারও তাই হয়েছিলো। বারোটা ইনজেকশন দিতেই দুর্বলতা কেটে গেছে। কিন্তু তুমি কোন ভালো ডাক্তারকে দেখাও না কেন?'

জায়েদী নিজের চশমা খুলে রুমাল দিয়ে কাচ মুছতে শুরু করলো। তার চোখের নীচে কালো দাগ পড়ে গেছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'রাতে ঘুম হয় না?'

'খুব কম।'

'মাথায় বায়ু চড়ে গেছে।'

'কে জানে কি!' বলেই জায়েদী একেবারে গম্ভীর হয়ে গেল, 'দেখো সা'দত, আমি তোমাকে একটা অদ্ভুত কথা বলতে এসেছি। আসলে রোগ-টোগ কিছু না। রাতে আমি খুব ভয়ে ভয়ে থাকি। ঘুম হয় না।'

'ভয়ে ভয়ে থাকো—কেন?'

'বলছি।' বলে জায়েদী কম্পিত হাতে সিগ্রেট জ্বালালো। তারপর নিভে-যাওয়া ম্যাচের কাঠিটা ভাঙ্গতে শুরু করলো। 'আমি জানি না, শুনে তুমি কি বলবে। তবে এটা সত্য যে, আমি ভয় পাই এবং তাও একটা বিড়ালকে।'

'বিড়ালকে!'

আমি সম্ভবতঃ হেসে উঠেছিলাম। কেননা জায়েদী তৎক্ষণাৎ গাম্ভীর্যের সাথে বললো, 'হেসো না—এটা বাস্তব সত্য। আমি তোমার কাছে এসেছি এজন্যে যে, মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ে তোমার ভালো ধারণা আছে। সম্ভবতঃ তুমি আমার এই ভয়ের কারণ বলতে পারবে।'

আমি বললাম, 'কিন্তু এখানে তো প্রশ্ন একটা বিড়ালের।'

জায়েদী রেগে গেলো। 'তুমি এভাবে ঠাট্টা করলে আমি কিছুই বলবো না।'

'না না জায়েদী, আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমি মনোযোগ দিয়ে শুনবো, তুমি বলো।'

কিছুক্ষণ চুপ থেকে এবং আরেকটা নতুন সিগ্রেট জ্বালিয়ে জায়েদী

আবার বলতে শুরু করলো, 'তুমি তো জানো যেখানে আমি থাকি, ওখানে দু'টি কামরা আছে। প্রথম কামরার ওদিকে ছোট একটা বেলকনি আছে—যার চারপাশে লোহার রেলিং দেয়া। এপ্রিল এবং মে মাসে যেহেতু খুব গরম পড়ে, এজন্য মেঝেতে বিছানা পেতে আমি সে বেকলনিতেই রাত কাটাই। এখন জুন মাস। এটা এপ্রিল মাসের কথা। আমি সকালে নাস্তা করে অফিসে যাবার জন্য বেরুলাম। দরোজা খুলতেই দেখলাম, দহলিজের কাছে একটা মোটা বিড়াল চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে। আমি জুতো দিয়ে একটা লাথি মারলাম। সে এক মুহূর্তের জন্য চোখ খুললো। আমার দিকে বড় অবজ্ঞাভরে তাকালো; যেন আমি বড় কিছুই নই। তারপর আবার চোখ বন্ধ করে ফেললো। আমি আশ্চর্য হলাম। সুতরাং আমি আবারো লাথি মারলাম। সে চোখ খুললো। আমার দিকে আবার আগের মতো তাকালো এবং উঠে অন্য সিঁড়ির কাছে গিয়ে শুয়ে পড়লো। যে ভঙ্গীতে সে পা ফেলছিলো, যেন আমাকে তার একদম পছন্দ হয়নি। আমার খুব রাগ ধরে গেলো। এবার এমন জোরে এক লাথি মারলাম যে, প্রায় দশ-পনের সিঁড়ি দূরে গিয়ে ছিটকে পড়লো সে। তারপর ওখান থেকে খোঁড়াতে খোঁড়াতে কোন রকমে চার পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ালো। আমার দিকে পীলা চোখে পিট পিট করে তাকালো। তারপর চুপচাপ একদিকে চলে গেল। তুমি মনোযোগ দিয়ে শুনছো তো?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

জায়েদী সিগ্রেটের ছাই ঝেড়ে আবার বলতে শুরু করলো, 'অফিসে গিয়ে আমি সবকিছু ভুলে গেলাম। কিন্তু বিকেলে বাসায় ফিরে এসে সেই দহলিজের কাছে পৌঁছতেই সকালের ঘটনাটা আবার মনের ভেতরে চাঙ্গা হয়ে উঠলো। স্নান করতে গিয়ে, চা খেতে গিয়ে, রাতের খাবার খেতে গিয়ে আমি কয়েকবার ভাবলাম। তিনবার আমি তার পাঁজর লক্ষ্য করে লাথি মারলাম, কিন্তু সে আমাকে ভয় পেলো না।

কেন? মিউ পর্যন্ত করলো না? তার উপর হাঁটার, চোখ বন্ধকরার, চোখ খোলার ভঙ্গী কি! যেন কোন কিছুতে তার পরওয়া নেই। বিড়ালটার উপর প্রয়োজনের অতিরিক্ত চিন্তা-ভাবনা করার দরুন বড় মুশকিলে পড়ে গেলাম। একটা সাধারণ জানোয়ারের উপর এতো গুরুত্বই বা দিচ্ছি কেন? এর জবাব না পেলাম তখন, না পেলাম এখন। অথচ এ ঘটনার পর পুরো তিনমাস অতিবাহিত হয়ে গেছে।'

এ পর্যন্ত বলে জায়েদী থামলো।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ব্যাস এই?'

'না।' জায়েদী এ্যাসট্রের উপর সিগ্রেট রাখতে রাখতে বললো, 'আমি শুধু তোমাকে বলতে চাচ্ছিলাম, বিড়ালটার উপর আমি এতো গুরুত্ব দিচ্ছি কেন? কেন এতো ভয় পাচ্ছি? ব্যাপারটা আমার এখনো বোধগম্য হচ্ছে না। সম্ভবতঃ তুমি আমার চেয়ে ভালো বলতে পারবে।'

আমি বললাম, 'পুরো ব্যাপারটা আমাকে জানতে হবে।'

জায়েদী এ্যাসট্রের উপর থেকে সিগ্রেট তুলে নিলো। এবং একটা টান মেরে বললো, 'বলছি শোন, সে ঘটনার পর অনেকদিন অতিবাহিত হয়ে গেছে, কিন্তু বিড়ালটাকে আর চোখে পড়েনি। সম্ভবতঃ সপ্তাহের শেষ রাত হবে, আমি বাইরে বেলকনিতে শুয়ে ছিলাম। রাত দু'টোর দিকে কামরায় কিসের আওয়াজে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেলো। উঠে বাতি জালিয়ে দেখলাম, সেই বিড়ালটাই ডাইনিং টেবিলের উপর দাঁড়িয়ে ডিসের ঢাকনা খুলে পুডিং খাচ্ছে। আমি প্রথমে সস্ সস্ করলাম, কিন্তু সে তার কাজে ব্যস্ত থাকলো। আমার দিকে ফিরেও তাকালো না। আমি একটা চপ্পল খুলে ছুঁড়ে মারলাম। চপ্পল তার পেটে গিয়ে লাগলো, কিন্তু এরপরও সে বেপরওয়াভাবে পুডিং খেতেই ব্যস্ত থাকলো। এবার আমি রাগের চোটে মশারির ডাণ্ডা খুলে নিলাম এবং কাছে গিয়ে তার পিঠে মারলাম। সে আরো বেপরওয়াভাবে আমার দিকে তাকালো। বড় আরাম করে চেয়ারের উপর লাফিয়ে পড়লো। কোন শব্দ না করেই মেঝেতে নেমে এলো এবং আস্তে আস্তে হেলে দুলে বেলকনির রেলিংয়ের ভেতর দিয়ে লাফিয়ে অলিন্দে চলে গেলো। আমি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম আর ভাবতে লাগলাম,

এ কেমনতরো জানোয়ার—মারপিটেও যার কিছু হয় না! সা'দত, আমি সত্যি বলছি, বড় ভয়ানক বিড়াল ওঠা। ইয়া মোঠা মাথা, গায়ের রঙ সাদা, কিন্তু প্রায়শঃ ময়লা থাকে। আমি এমন ময়লা অপবিত্র বিড়াল জীবনেও দেখিনি।'

জায়েদী এ্যাসট্রের ভেতরে সিগ্রেটটা নিভিয়ে দিলো। তারপর চুপ করে গেলো।

আমি বললাম, 'বিড়াল তো নিজেদের খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে।'

'তা রাখে' জায়েদী উঠে দাঁড়ালো, 'কিন্তু এই বিড়ালটা বোধ হয় ইচ্ছে করেই অপরিচ্ছন্ন থাকে। শুতে হলে ময়লা জায়গায় শোয়, কান থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে, সম্ভব হলে ওটাকে আবার জিভ দিয়ে চেটে চেটে পরিষ্কার করে। মাথা ফেটে আছে, কিন্তু সেদিকে তার খেয়াল নেই। ব্যাস সারাদিন শুধু দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে ফিরে।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কিন্তু এতে ভয় পাবার কি আছে?'

জায়েদী বসে পড়লো। 'সেটাই তো আমি জানতে চাচ্ছি। ভয়ের একটা কারণ এও হতে পারে যে, দশ-পনের রাত বিড়ালটা আমাকে ক্রমাগত জ্বালিয়ে মেরেছে, আমার ঘুম নষ্ট করেছে। আমার হাতে সব সময় মারও খেয়েছে। বড় বিশ্রী মার। ইচ্ছে করলে সে আমার ঘরমুখো নাও হতে পারতো, কারণ শত হলেও জানোয়ারদেরও বুদ্ধি বলতে একটা জিনিষ আছে। আমি চিন্তা করলাম, একদিন আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে না তো! আমার চোখ-মুখ নখের আঁচড়ে ক্ষত-বিক্ষত করে দেবে না তো! শুনেছি কোন বিড়াল বা বিড়ালীকে ধরে মারলে, সে এক সময় আক্রমণ করে তার প্রতিশোধ নেয়।'

আমি বললাম, 'অবশ্য তোমার এই ভয়ের কারণটা যুক্তিসঙ্গত।'

জায়েদী আবার উঠে দাঁড়ালো। 'কিন্তু তোমার এ কথায় তো আমি আশ্বস্ত হতে পারলাম না।'

আমার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেলো। 'তুমি তাকে আদর সোহাগ করে দেখো না।'

'তাও করে শেষ করেছি। আমার ধারণা ছিলো এতো পিটুনি দেয়ার পর হয়তো সে আমাকে তার শরীর ছুঁতেও দেবে না। কিন্তু ব্যাপারটা

সম্পূর্ণ উল্টোও বলা যায়। কারণ সে আমার আদর-সোহাগের তোয়াক্কাই করলো না। একদিন আমি সোফায় বসেছিলাম। এ সময় সে এসে আমার পাশে মেঝেতে বসে পড়লো। আমি ভয়ে ভয়ে তার দিকে হাত বাড়ালাম। সে চোখ বন্ধ করে ফেললো। আমি আস্তে আস্তে তার পিঠে হাত বুলোতে শুরু করলাম। সা'দত, বিশ্বাস করো, সে তেমনি চোখ বন্ধ করে বসে থাকলো। বিড়াল-বিড়ালীরা সাধারণতঃ লেজ নেড়ে আদর-সোহাগের জবাব দেয়। কিন্তু জানোয়ারটা লেজ তো দূরে থাক, একটা লোমও নাড়লো না। আমি বিরক্ত হয়ে তার মাথার উপর বই ছুঁড়ে মারলাম। চোট খেয়ে সে উঠে দাঁড়ালো। বড় বেপরওয়াভাবে, অনেকটা অমনোযোগীর দৃষ্টিতে আমার দিকে পিট পিট করে তাকালো। তারপর বেলকনির রেলিংয়ের ফাঁক দিয়ে অলিন্দে ঝাঁপিয়ে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেলো। ব্যাস সেদিন থেকে রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টা সে কেবল আমার মন-মগজে ভিড় জমাতে থাকলো।'

এ কথা বলেই জায়েদী আমার সামনের চেয়ারে বসে পড়লো। এবং জোরে জোরে পা জোড়া দোলাতে থাকলো।

আমি স্রেফ এটুকুন বললাম, 'কিছুই বুঝে আসছে না।' তবে জায়েদীর ভয় যে একেবারে অর্থহীন নয় তা কিন্তু বুঝতে পারছিলাম।

জায়েদী দাঁতে নখ কাটতে লাগলো। 'আমারও কিছু বুঝে আসে না। এজন্যই আমি তোমার কাছে ছুটে এসেছি।'

এ কথা বলে সে উঠে দাঁড়ালো এবং কামরায় পায়চারী করতে লাগলো। কিছুক্ষণ পর থমকে দাঁড়ালো এবং এ্যাসট্রের ভেতর থেকে একটি পরিত্যাক্ত ম্যাচের কাঠি তুলে নিয়ে তা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করতে লাগলো। 'এখন অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে সারারাত ঘুম হয় না। একটু আওয়াজ পেলেই মনে হয় বুঝি বিড়ালটা এলো। কিন্তু গত আটদিন থেকে সে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। কে জানে, কেউ কি মেরে ফেললো, না কোথাও চলে গেছে?'

আমি বললাম, 'কেন এতো ভাবছো? ও পালিয়ে গেছে, ভালোই হয়েছে।'

'জানি না, কেন ভাবছি। অনেক চেষ্টা করেছি হতভাগাকে ভুলে থাকার জন্য, কিন্তু মন থেকে মুছতে পারছি না।' বলেই সে মাথার নীচে গদি রেখে সোফার উপর শুয়ে পড়লো। 'বড় অদ্ভুত কাহিনী। অন্য কেউ শুনলে হাসবে। একটা সামান্য বিড়াল আমাকে কেমন করে ফেললো। অনেক সময় আমার নিজেরও হাসি পায়। কিন্তু সে হাসি বড় দুঃখের হাসি।'

জায়েদী এবার থামলো।

এবং আমিও অনুভব করলাম, সত্যি নিজের অসহায়তার উপর হাসতে গিয়ে বেচারা অনেক কষ্ট পাচ্ছে। এ পর্যন্ত যা কিছুই সে বলেছে, সবই হাসির ব্যাপার। তবে এটা সত্য যে, বিড়ালের রূপে জায়েদীর জীবনে এমন কোন দুর্ঘটনা লুকিয়ে আছে—যেটা এখন তার একেবারেই মনে নেই। অতএব আমি বললাম, 'জায়েদী, অতীতে তোমার এমন কোন দুর্ঘটনা তো ঘটেনি—যেটাকে তুমি বিড়ালটার সঙ্গে মিলাচ্ছ। অর্থাৎ এমন কোন জিনিষ, ঘটনা—যার দ্বারা তুমি ভয় পেয়েছো—এবং সেই জিনিষ বা ঘটনার সাথে বিড়ালটার মিল আছে?'

কথাটা বলেই আমি ভাবলাম, ঘটনার সাথে বিড়ালের আবার মিল থাকে কি করে!

জায়েদী জবাব দিলো, 'আমি তাও চিন্তা করেছি। আমার জানা মতে তেমন কোন ঘটনা বা জিনিষ নেই।'

আমি বললাম, 'দেখো, হয়তো কোনদিন মনে পড়েও যেতে পারে।'

'তা পারে।' এ কথা বলে জায়েদী সোফায় সোজা হয়ে বসলো। কয়েক মিনিট এ-কথা সে-কথার পর আমাকে আর আমার স্ত্রীকে রোববারে খাবার নেমন্তন্ন করে চলে গেলো।

রোববার আমি আর আমার স্ত্রী সান্তাক্রুজ গেলাম। আমি সম্ভবতঃ আপনাদের বলিনি, জায়েদী আমার খুবই পুরনো বন্ধু। এনট্রান্স পর্যন্ত আমরা দু'জন একই স্কুলে পড়ালেখা করেছি। কলেজেও

আমরা দু'বছর একসাথে ছিলাম। পরে আমি ফেল করলাম আর সে এফ. এ. পাশ করে অমৃতসর ছেড়ে লাহোর চলে গেলো। সেখানে সে এম. এ. পাশ করলো এবং চার-পাঁচ বছর বেকার থাকার পর বোম্বে চলে এলো। এখানে সে গত এক বছর থেকে একটি জাহাজ কোম্পানীতে চাকুরী করছে।

দুপুরে খাবার পর……আমরা অনেকক্ষণ ধরে নতুন আর পুরনো ছবি সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করতে থাকলাম। জায়েদীর স্ত্রী আর আমার স্ত্রী খুব বেশী ছবি দেখে, যাকে বলে ছবির পোকা। তাই আলোচনায় ওরাই বেশীর ভাগ অংশ নিতে থাকলো। এক সময় ওরা দু'জন উঠে পাশের কামরায় চলে যাবে, ঠিক এ সময় বেলকনির রেলিংয়ের ফাঁক দিয়ে একটি বিড়াল ভেতরে প্রবেশ করলো। আমি আর জায়েদী একই সাথে বিড়ালটির দিকে তাকালাম। জায়েদীর চেহারা দেখেই আমি বুঝে ফেলেছি, এটাই সেই বিড়াল।

আমি গভীরভাবে বিড়ালটির দিকে তাকালাম। কানের কাছে মাথার উপর একটা গভীর ক্ষত—যার উপর হলুদ লেগে রয়েছে। গায়ে অজস্র ময়লা। চালচলনে যে রকম জায়েদী বলেছিলো, এক অদ্ভুত বেপরওয়া ভাব। আমরা চারজন মানুষ কামরায় উপস্থিত, কিন্তু কারো দিকে সে চোখ তুলে পর্যন্ত তাকালো না। বিড়ালটি আমার স্ত্রীর পাশ দিয়ে হেঁটে যাবার সময় সে জোরে চেঁচিয়ে উঠলো, 'এ কেমনতরো বিড়াল!'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'মানে?'

আমার স্ত্রী জবাব দিলো, 'পুরো বদমাশ মনে হয়।'

জায়েদী থতমত খেয়ে গেলো, 'বদমাশ!'

আমার স্ত্রী লজ্জা পেয়ে গেলো, 'জী, তাই মনে হয়।'

জায়েদী কি যেন ভাবতে লাগলো। ওরা দু'জন পাশের কামরায় চলে গেলো। কিছুক্ষণ পর জায়েদী উঠে দাঁড়ালো, 'সা'দত, একটু এদিকে এসো।'

আমাকে বেলকনিতে নিয়ে গিয়ে সে বললো, 'ব্যাপারটার মীমাংসা হয়ে গেছে।'

'কি ভাবে ?'

'তোমার স্ত্রীই মীমাংশা করে দিয়েছে। তুমিও ভেবে দেখো না, বিড়ালটার সাথে মিস টিনওয়ালার মিল আছে কি না !'

'মিস টিনওয়ালার ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। সেই বদমাশটার সাথে—যে কিনা সব সময় আমাদের ইস্কুলের বাইরে বসে থাকতো। মুস্তফা যাকে মিস টিনওয়ালা বলতো।'

আমার মনে পড়লো। জায়েদী ছেলেবেলায় খুব সুন্দর ছিলো। তাই তার প্রতি মিস টিনওয়ালার বিশেষ নজর ছিলো। কিন্তু আমি ভাবছিলাম, বিড়ালের সাথে তার আকৃতির মিল কিভাবে থাকতে পারে ! না না, মিল আছে। তার চালচলনেও বিড়ালটার মতো কিছুটা বেপরওয়া ভাব ছিলো। প্রায়শঃ তার মাথা ফাটা থাকতো। কয়েকবার হেড মাষ্টার সাহেব লোক লাগিয়ে ওকে খুব পিটুনি দিয়েছিলেন—যেন ইস্কুলের দরোজার সামনে না দাঁড়ায়। কিন্তু সে তোয়াক্কাই করেনি। এক ছাত্রের বাবা তাকে হকি ষ্টিক দিয়ে এমন মেরেছিলো যে, সবাই ভেবেছিলো বুঝি সে হাসপাতালেই মারা যাবে। কিন্তু পরদিন তাকে আবারো স্কুলের বাইরে দরোজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে।

এসব ঘটনাবলী মুহূর্তের জন্য আমার মন-মগজে এসে ভিড় জমালো। আমি জায়েদীকে বললাম, 'তুমি ঠিকই বলছো। মিস টিনওয়ালাও মার খেয়ে চুপ করে যেতো।'

জায়েদী কোন জবাব দিলো না। কারণ সে কিছু একটা যেন মনে করার চেষ্টা করছে। কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর বললো, 'আমি তখন অষ্টম শ্রেণীতে ছিলাম। পড়ার জন্য একবার কোম্পানীবাগে চলে গিয়েছিলাম। এবং একটি গাছের নীচে বসে বসে পড়ছিলাম। এ সময় আচমকা মিস টিনওয়ালা এসে উপস্থিত হলো। হাতে একখানা চিঠি। আমাকে বলতে লাগলো, বাবুজী, চিঠিখানি পড়ে দিন।—তাকে দেখেই তো আমার প্রাণপাখী হাওয়া। আশেপাশেও কেউ নেই। মিস টিনওয়ালা চিঠিখানা আমার উরুর উপর বিছিয়ে

দিলো। আমি উঠে পালালাম। সেও আমার পিছু নিলো। কিন্তু আমি এতো জোরে দৌড়ালাম যে, সে আমার অনেক পেছনে পড়ে রইলো। ঘরে পৌঁছতেই আমার ভীষণ জ্বর এলো। দুদিন জ্বরে পড়ে রইলাম। আমার মার ধারণা, যে গাছের নীচে আমি পড়তে বসেছিলাম, ওটা একটা ভূতুড়ে গাছ।'

জায়েদী এ ঘটনা বলার সময় বিড়ালটা আমাদের হাঁটুর কাছ দিয়ে হেঁটে গিয়ে রেলিংয়ের ফাঁক দিয়ে বাইরের অলিন্দে লাফিয়ে পড়লো। তারপর কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে পীলা চোখে আমাদের দিকে নেহাত বেপরওয়াভাবে তাকালো। আমি হেসে বললাম, 'মিস টিনওয়ালা!'

জায়েদী হঠাৎ যেন কেমন হয়ে গেলো।

উৎসাহ উদ্দীপনা

আজ থেকে ঠিক আট বছর আগের কথা।

হিন্দুসভা কলেজের সামনে খুব সুন্দর দেখতে যে 'বিয়ে বাড়ী'টা (শাদী ঘর) আছে, সে বাড়ীতে আমার বন্ধু বিশ্বেশ্বর নাথের বরযাত্রী এসে উঠেছে। আনুমানিক তিন সাড়ে তিনশ'র মত হবে অতিথি। ওরা সবাই অমৃতসর আর লাহোরের বিখ্যাত বাঈজীদের নাচ-গান শুনে পরিশ্রান্ত হয়ে বিরাট প্রাসাদোপম বিল্ডিংটার বিভিন্ন কামরায়, কেউ চেয়ারে, কেউ কার্পেটে গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ে আছে।

চারটা বেজে গেছে। বিশ্বেশ্বর নাথের সঙ্গে একটি আলাদা কামরায় তার বিশেষ ক'জন বন্ধুর সঙ্গে বসে বসে খুব হুইস্কি পান করছিলাম। তার রেশ তখনো আমার চোখ থেকে যায়নি। হলঘরের গোল ঘড়িটা চারটা বাজার সময় সংকেত ঘোষণা করার সাথে সাথে আমার চোখ খুলে গেলো। বোধ হয় কোন স্বপ্ন-টপ্ন দেখছিলাম। কারণ চোখের পাতায় কিছু একটা জড়িয়ে আছে মনে হলো।

এক চোখ বন্ধ করে,—সম্ভবত অন্য চোখ এই ফাঁকে আরো কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে থাক, এই উদ্দেশ্যে—আমি মেঝেতে দৃষ্টি বুলিয়ে নিলাম। সবাই ঘুমিয়ে আছে। কেউ উপুড় হয়ে, কেউ সোজা হয়ে এবং কেউ কেউ চাকুর মতো বাঁকা হয়ে শুয়ে আছে। আমি এবার বাকী চোখটাও খুললাম এবং ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম। রাতে পান করার পর আমরা সবাই হলে এসে যখন শুয়েছিলাম, তখন আসগর আলী গোঁ ধরেছিলো কোল বালিশ নিয়ে ঘুমোব বলে। কোল বালিশ আমার মাথা থেকে কিছু দূরে পড়ে আছে। কিন্তু আসগর আলী নেই।

আমি ভাবলাম, পর পর ক'রাত জেগে কাটিয়েছে। তাই এখন হয়তো অনেক দূরের রামবাগে গিয়ে কোন মামুলী ময়লা বিছানায় শুয়ে আছে।

আসগর আলীর জন্য মদ, সে দেশী হোক কি বিদেশী, দ্রুতগামী গাড়ীর মতো যেন। যেটা তাকে মেয়েদের দিকে দ্রুত টেনে নিয়ে যায়। মদ খাবার পর তো সাধারণতঃ নিরানব্বই ভাগ মানুষকে সুন্দরের দিকে টানে। কিন্তু আসগর আলী—যে কিনা নিতান্তই একজন ভালো ফটোগ্রাফার আর পেইন্টার, এবং যে কিনা রঙ আর রেখার সঠিক সংমিশ্রণ জানে, কিন্তু মদ পান করার পর সব সময়ই নেহাত বিশ্রী কদাকার ছবি মানুষের সামনে পেশ করে থাকে।

আমার চোখের পাতায় জড়িয়ে-থাকা স্বপ্নের টুকরো অদৃশ্য হয়ে গেছে। এবং আমি আসগর আলীকে নিয়েই ভাবতে শুরু করে দিলাম, যেটা মোটেই স্বপ্ন নয়। কোন বালিশের ওপর তার দীর্ঘ কেশধারী মস্তকের ভার যেন আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

মদ পান করার পর মন-মস্তিষ্ক অমন জড়িয়ে যায় কেন তা অনেক চিন্তা-ভাবনার পরও আমি বুঝে উঠতে পারলাম না। ঠিক জড়িয়ে যায় বলা যাবে না। কেননা মদ পান করার পর সে খুব ভয়ানকভাবে জেগে উঠে এবং এক একটা গভীর অন্ধকার গলির মধ্যেও রাস্তা খুঁজে খুঁজে টলতে টলতে কোন না কোন দেহপসারিণীর কাছে গিয়ে ঠিকই পেঁাছে যায়। পরদিন সকালে তার ময়লা অপবিত্র শয্যা ত্যাগ করে গোসল-গা ধুয়ে যখন নিজের ষ্টুডিওতে গিয়ে পেঁাছে এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুন্দর স্বাস্থ্যবতী যুবতী মেয়েদের ছবি তোলে, তখন চোখে পাশবিকতার ক্ষীণতম ছোঁয়াও দেখা যায় না—যেটা সব মস্তঃপর চোখে লক্ষ্য করা যায়।

বিশ্বাস করুন মদ পান করার পর সে খুব উচ্ছৃংখল হয়ে যায়। বেশ কিছুক্ষণের জন্য হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে বসে। মানুষ কত পান করতে পারে? ছ-সাত-আট পেগ, কিন্তু স্বভাবতঃই এসব ক্ষতিকারক তরল বস্তুর ছ-সাত চুমুক তাকে কামনা-বাসনার অথৈ সাগরে ডুবিয়ে মারে।

আপনি হুইস্কির সঙ্গে সোডা কিবা পানি মেশাতে পারেন, কিন্তু তার সাথে নারী যোগ করা, অন্ততঃ আমার বোধের অগম্য। মানুষ মদ খায়—দুঃখ ভুলে থাকার জন্য। কিন্তু নারী তো কোন দুঃখ নয়। মানুষ মদ খায় হৈ-হল্লা করার জন্য। কিন্তু নারী তো হৈ-হল্লা নয়।

রাতে আসগর মদ পান করে খুব চেঁচামেচি করেছে। বিয়েশাদীতে এমনিতেই প্রচুর হৈ-হল্লা হয়, এজন্যই আসগরের চেঁচামেচি বিয়ে বাড়ীর হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যেই হারিয়ে গেছে। তা না হলে খুব বিপদ হতো। একবার হুইস্কির ভরা গ্লাস হাতে নিয়ে এই বলতে বলতে বেরিয়ে গেলো, 'আমি খুব উঁচুদরের মানুষ—উঁচু জায়গায় বসেই পান করবো।'

আমার ধারণা ছিলো, রামবাগে কোন উঁচু ঘরের খোঁজে বেরিয়ে গেছে হয়তো। কিন্তু কিছুক্ষণ পর দরজা খুলে দেখি বড় একটা কাঠের সিঁড়ি নিয়ে ভেতরে ঢুকলো আসগর। এবং সিঁড়িটা দেয়ালের সাথে দাঁড় করিয়ে সবচেয়ে উপরের ধাপে উঠে ছাদের সঙ্গে মাথা ঠেকিয়ে বসে বসে মদ পান করতে লাগলো।

বহুকষ্টে আমি আর বিশ্বেশ্বর নাথ ওকে নীচে নামালাম। বুঝালাম, এসব কাণ্ডকারখানা তখনি ভালো লাগে যখন ঘরে কেউ থাকে না। 'বিয়ে বাড়ী' নিমন্ত্রিত অতিথিতে ভরপুর। ওর চুপ থাকা উচিত। জানি না, কিভাবে যেন এ কথাটা তার মগজে গেঁথে গেলো। কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত পার্টি চালু ছিলো, সে এক কোণে চুপচাপ বসে বসে শুধু হুইস্কি পান করতে থাকলো।

এ সবকিছু ভাবতে ভাবতে আমি উঠলাম এবং বাইরে বেলকনিতে গিয়ে দাঁড়ালাম। সামনে হিন্দুসভা কলেজের লাল লাল ইঁটের ইমারতগুলো ভোরের নির্জন কুয়াশাচ্ছন্নতায় ডুবে আছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি, কয়েকটি অস্পষ্ট তারা দূর আকাশে মিটিমিটি করে কাঁপছে।

মার্চের শেষ ক'দিনের কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া সারা শরীরে ধীরে ধীরে পরশ বুলিয়ে দিচ্ছে। মনে মনে ভাবলাম, ওপরে যাই। খোলা জায়গা আছে। কিছুক্ষণ চিলে কোঠার মেঝেতে শুয়ে থাকবো। ঠাণ্ডা লাগার দরুন শরীরটা যে ম্যাজ ম্যাজ করছে, ভালো লাগবে।

লম্বা বারান্দা অতিক্রম করে সিঁড়ির গোড়ায় এসে পৌঁছতেই ওপর থেকে কারো নেমে আসার পদশব্দ শুনতে পেলাম আমি। কিছুক্ষণ পর আসগরকে দেখা গেলো। আমার সাথে কোন কথাবার্তা না

বলেই সে পাশ কেটে নীচে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেলো। অন্ধকার ছিলো বলে আমি ভাবলাম, বোধ হয় সে আমাকে দেখতে পায়নি। সুতরাং ধীরে ধীরে সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপরে উঠতে শুরু করলাম আমি।

সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপরে ওঠার সময় প্রতিটি ধাপ গুণে গুণে ওঠা আমার নিত্যদিনের অভ্যেস। আমি মনে মনে বললাম—চব্বিশ। এবং শেষ ধাপে উঠেই আমি অকস্মাৎ একজন মহিলা দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পেলাম। আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। কেননা আমরা প্রায় পরস্পরের গায়ের উপর এসে পড়েছি হুমড়ি খেয়ে।

'মাফ করবেন……উহঃ আপনি?'

মহিলাটি সারদা। আমাদের পড়শী হরনামকোর বড় মেয়ে। বিয়ের এক বছর পরই মেয়েটি বিধবা হয়ে গেছে। আমি কিছু বলার আগেই মেয়েটি তাড়াতাড়ি আমাকে জিজ্ঞেস করলো, 'এক্ষুণি যে নীচে নেমে গেলো, লোকটা কে?'

'কে?'

'ওই যে লোকটা, এক্ষুণি যে নীচে নেমে গেলো। আপনি তাকে চেনেন?'

'চিনি।'

'কে লোকটা?'

'আসগর।'

'আসগর!' নামটা যেন দাঁতের ভেতর নিয়ে পিষে ফেললো মেয়েটি। আর যা কিছু ঘটেছে আমিও বুঝে ফেললাম।

'সে কি কোন খারাপ কিছু করেছে?'

'খারাপ কিছু!' সারদার দোহারা শরীর রাগে কেঁপে উঠলো। 'কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করি, সে আমাকে কি মনে করেছে……' বলতে বলতে ওর ছোট ছোট চোখ দু'টি অশ্রুতে ভিজে গেলো। 'সে……সে……' ওর কণ্ঠস্বর রোধ হয়ে এলো। দু'হাতে মুখ ঢেকে অঝোরে কাঁদতে শুরু করলো সারদা।

মহা সমস্যায় পড়ে গেলাম আমি। চিন্তা করতে লাগলাম। কান্নার আওয়াজ শুনে যদি কেউ ওপরে চলে আসে তাহলে কিন্তু গণ্ডগোল

বেঁধে যাবে। সারদার চারটা ভাই আছে। এবং তারা সবাই এখন এই বিয়ে বাড়ীতেই উপস্থিত আছে। তার মধ্যে দু'জন তো সব সময়ই অন্যের সঙ্গে হাঙ্গামা বাঁধাবার অজুহাত খুঁজে বেড়ায়। আসগর আলীর আজ আর রক্ষা নেই।

আমি ওকে বুঝাতে শুরু করলাম, 'দেখুন, আপনি কান্নাকাটি বন্ধ করুন……কেউ শুনে ফেলবে।'

একেবারে মুখ থেকে দু'হাত সরিয়ে জোর গলায় বললো সে, 'শুনুক……আমি শোনাতেই তো চাই……তা লোকটা আমাকে পেয়েছে কি?……পাড়ার মেয়েছেলে মনে করেছে?……আমি……আমি……'

আবার তার কণ্ঠরোধ হয়ে এলো।

'আমার মনে হয় ব্যাপারটা এখানেই চাপা দেয়া ভালো।'

'কেন?'

'দুর্ণাম হবে।'

'কার দুর্ণাম?—আমার না তার?'

'দুর্ণাম তো তারই হবে। কিন্তু কাদায় হাত ডুবিয়ে কি লাভ?' এ কথা বলেই আমি পকেট থেকে রুমাল বের করে ওকে দিলাম। 'নিন, চোখ মুছে ফেলুন।'

রুমালটা মেঝেতে ফেলে দিয়ে সে চিলে কোঠায় বসে পড়লো। আমি রুমালটা কুড়িয়ে নিয়ে পকেটে রেখে দিলাম। 'সারদা দেবী, আসগর আমার বন্ধু। সে যে ভুল করেছে তার জন্য আমি ক্ষমা চাইছি।'

'আপনি কেন ক্ষমা চাইছেন?'

ব্যাপারটা মিটমাট করে ফেলতে চাই। আপনি যদি বলেন তাকে আমি এখানে নিয়ে আসছি। আপনার সামনে নাকে খত দেবে সে।'

ঘৃণায় মুখ ঘুরিয়ে নিলো সে। 'না, তাকে আমার সামনে আনবেন না। সে আমাকে অপমান করেছে।' বলতে বলতে আবারো তার কণ্ঠ রোধ হয়ে এলো। এবং চিলে কোঠার মেঝেতে কনুইয়ে ভর দিয়ে লম্বা হয়ে উদ্গত আবেগের ফোয়ারা চেপে রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করলো।

আমি থতমত খেয়ে গেলাম। একটি সুস্থ সবল যুবতী মেয়ে

আমার সামনে অশ্রু বিসর্জন দিচ্ছে। অথচ আমি কোনক্রমেই তার কান্না থামাতে পারছি না। একবার এই আসগরেরই মোটরগাড়ী চালাবার সময় আমি একটি কুকুরের প্রাণ রক্ষা করতে গিয়ে গাড়ীর হর্ণ বাজালাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে হর্ণটা এমনভাবে জোরে একটানা বাজতে থাকলো যে, ওটি আর থামে না। অনেক চেষ্টা করেও হর্ণের সেই বিরামহীন বিকট গর্জন থামাতে পারলাম না……লোকজন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলো আর আমি নিরুপায় মূর্তির মতো বসে রইলাম।

খোদার কাছে কৃতজ্ঞ যে, কোঠায় আমি আর সারদা ছাড়া অন্য কেউ ছিলো না। কিন্তু আমার অবস্থা তখন সেই হর্ণের ব্যাপারটার মতো। আমি নির্বাক অসহায়। আমার সামনে একটি যুবতী কাঁদছে, মনে তার বড় চোট লেগেছে।

অন্য কোন মেয়ে হলে আমি সামান্য কিছুক্ষণ নিজের কর্তব্য পালন করে সরে পড়তাম। কিন্তু সারদা আমার প্রতিবেশী মেয়ে, শৈশবকাল থেকে তাকে আমি চিনি।

বড় ভালো মেয়ে সে। তিন বোনের মধ্যে সে একটু কম সুন্দরী হলেও, তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন মেয়ে। বিভিন্ন সুঁই-সুতোর কাজে খুব পারদর্শী। কিন্তু কথা বলে কম। গত বছর বিয়ের ঠিক সাড়ে এগারো মাসের মাথায় ট্রেন দুর্ঘটনায় তার স্বামী মারা গেলে আমাদের ঘরের সবাই খুব দুঃখ পেয়েছিলো।

স্বামীর বিয়োগ ব্যথা এক জিনিষ। কিন্তু আমার একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু তাকে যে দুঃখ দিয়েছে তার ব্যথা সম্পূর্ণ অন্য জিনিষ, বড় বেদনাদায়ক সে ব্যথা।

আমি আবারো চেষ্টা করলাম তার কান্না থামাবার জন্য। চিলে কোঠার মেঝেতে তার পাশে বসে আমি বললাম, 'সারদা, এভাবে কান্নাকাটি করা ঠিক নয়। যাও, নীচে চলে যাও। এবং যা কিছু হয়েছে সব ভুলে যাও। হতভাগা মদ পান করেছিলো। বিশ্বাস করো, তা না হলে লোক সে এতো মন্দ না। মদ খেলেই কেমন যেন হয়ে যায় সে।'

সারদার কান্না বন্ধ হলো না।

আমি জানি, আসগর তার সাথে কি করেছে। কারণ সব মানুষেরই রীতি ওই একটাই, দৈহিক। কিন্তু তবুও আমি সারদার মুখ থেকেই শুনতে চাই, আসগর তার সাথে কোন ধরনের খারাপ কাজ করেছে। সুতরাং আমি সহানুভূতিমাখা স্বরে বললাম, 'জানি না সে তোমার সঙ্গে কি খারাপ কাজ করেছে। তবে কিছু না কিছু তো বুঝি। তা তুমি ওপরে এসেছিলে কি জন্যে?'

সারদা কম্পিত স্বরে বললো, 'আমি নীচের কামরায় শুয়ে ছিলাম। দু'জন মহিলা আমার সম্পর্কে বিভিন্ন কথাবার্তা বলতে শুরু করে দিলো।' বলতে বলতে গলার স্বর আটকে যায় তার।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কি বলছিলো?'

সারদা মুখখানা মেঝের ওপর রেখে আবারো জোরে জোরে কাঁদতে শুরু করে দিলো।

আমি তার চওড়া কাঁধে মৃদু চাপড় দিতে শুরু করলাম।

'চুপ করো সারদা। চুপ করো!'

কাঁদতে কাঁদতে, হিঁচকি নিতে নিতে বললো সে, 'ওরা বলছিলো, ওরা বলছিলো—এই বিধবাকে কেন আবার ডাকলো?'

বিধবা বলার সময় সারদা অশ্রুমাখা আঁচলের কোণা মুখে পুরে দিলো। 'এ কথা শুনেই আমি কাঁদতে লাগলাম। এবং উপরে চলে এলাম……এবং……এবং……'

এ কথা শুনে আমিও মনে খুব দুঃখ পেলাম। নারী জাতি কত অত্যাচারী। বিশেষ করে বৃদ্ধা মহিলারা। ক্ষতস্থানটা তাজা হোক, চাই কি পুরনো। কেমন মজার সাথে তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়ায় ওরা। আমি সারদার হাত নিজের হাতে তুলে নিলাম, 'এসব কথায় মনোযোগ না দেয়াই উচিত।'

সে ছেলেমানুষের মতো খলবলিয়ে উঠলো, 'ওপরে এসে আমিও তাই ভেবেছিলাম এবং শুয়ে পড়েছিলাম। ঠিক,……ঠিক এ সময় আপনার বন্ধু এসে উপস্থিত। সে আমার ওড়না ধরে টান দিলো এবং……এবং আমার জামার বোতাম খুলে……'

ওর জামার বোতাম তখনো খোলা ছিলো।

'যেতে দাও সারদা, যা কিছু হয়েছে সব ভুলে যাও।' আমি পকেট থেকে রুমাল বের করে ওর চোখের অশ্রু মুছে দিতে লাগলাম।

আঁচলের কোণা তখনো তার মুখে ভরা ছিলো। বরং চিবোতে চিবোতে একেবারে মুখের ভেতরে নিয়ে গেছে। আমি ওড়নার আঁচল টেনে বের করে নিলাম। ওড়নার সেই ভেজা আঁচল আঙ্গুলে জড়াতে জড়াতে বড়ই দুঃখপূর্ণ স্বরে বললো সে, 'বিধবা মনে করেই আপনার বন্ধু আমার গায়ে হাত দিয়েছে। ভেবেছে ওর আছেই বা কে?'

'না তা নয় সারদা তা নয়।' আমি আস্তে করে তার মাথাটা আমার কাঁধে লাগিয়ে নিলাম। 'সে যা ভেবেছে, যা করেছে, সব গুলী মারো! এখন একটু চুপ করো।'

আমার ইচ্ছে হলো ঘুমপাড়ানীর গান শুনিয়ে ওকে শান্ত করি।

চোখের অশ্রু মুছে দিয়েছিলাম আমি, কিন্তু এখন আবার ভরে গেছে। ওড়নার আঁচল মুখে পুরে দিয়েছে আবার সে। আমি তার মুখ থেকে আঁচল বের করে আবার অশ্রু মুছে দিলাম। এবং ধীরে ধীরে তার দু'টি চোখে চুমু খেতে লাগলাম।

'ব্যাস, আর কেঁদো না।'

সারদা আমার বুকে মাথা রাখলো। আমি আস্তে আস্তে তার গালে মৃদু আদর জানাতে জানাতে বললাম, 'ব্যাস, ব্যাস, ব্যাস।'

কিছুক্ষণ পর আমি যখন নীচে নেমে এলাম, তখন মার্চের শেষ ক'টা দিনের ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়ায়, চিলে কোঠার মেঝের ওপর, আসগরের খারাপ কাজ ভুলে সারদা নিজের মখমলের ওড়না বুকে টেনে নিজেকে সম্পূর্ণ হালকা অনুভব করতে লাগলো। ওর উদ্ধত বুকে উত্তাল তরঙ্গের পরিবর্তে এখন উষ্ণতায় ভরা চির প্রশান্তি নেমে এসেছে!

নবাব সলিমুল্লাহ খান

নবাব সলিমুল্লাহ খান বড় জাঁকজমকপ্রিয় মানুষ। তার নিজের শহরের বড় বড় ধনীদের মধ্যে তাকেও একজন হিসেবে গণ্য করা হয়। কিন্তু তিনি অসৎ নন। তেমনি আরামপ্রিয়ও নন। বড় নির্বিরোধ, নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করেন। হাতে গোণা কিছু লোকের সাথেই তিনি মেলামেশা করেন, তাও যাদের তিনি পছন্দ করেন।

বিভিন্ন পার্টি অনুষ্ঠানও হয়। অতি সাধারণ। মদ-টদও চলে। তবে সীমার মধ্যে। জীবনের সবকিছুই তিনি সীমার মধ্যে থেকেই করতে ভালোবাসেন।

তাঁর বয়েস পঞ্চান্ন বছরের কাছাকাছি হবে। যখন তাঁর বয়েস চল্লিশ, তাঁর স্ত্রী হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। খুব দুঃখ পেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু খোদাতালার ইচ্ছাও বুঝি তাই ছিলো। সুতরাং দুঃখকে তিনি বরণ করে নিয়েছিলেন।

তাঁর কোন সন্তানাদি নেই। এই কারণে তিনি একেবারে নিঃসঙ্গ হয়ে যান। তাঁর বিরাট আলীশান বাড়ীতে চারজন চাকর আছে, যারা তাঁর আরাম আয়েশের দিকে লক্ষ্য রাখে আর অতিথি অভ্যাগতদের দেখাশুনা করে।

স্ত্রীর মৃত্যুর পনের বছর পর হঠাৎ নিজের দেশের প্রতি বিরক্ত হয়ে পড়েন তিনি। নিজের আপন প্রিয় চাকর মোয়াজ্জম আলীকে একদিন ডেকে বলেন, 'দেখো, এমন একজন এজেণ্ট খুঁজে বের করো, যে আমার সমস্ত সম্পত্তি উপযুক্ত দামে বিক্রি করিয়ে দিতে পারে।'

মোয়াজ্জম আলী বড় আশ্চর্য হলো। 'নবাব সাহেব, এ আপনি কি বলছেন? হুজুরের কিসের অভাব যে সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে দিতে চাইলেন? আপনার মাথার ওপর কোন ধারকর্জও নেই।'

নবাব সাহেব বড্ড বিমর্ষভাবে বলেন, 'মোয়াজ্জম আলী, এখান

থেকে আমার মন উঠে গেছে। এক এক ঘণ্টা আমার কাছে এক একটা বছরের মতো মনে হয়। আমি এখান থেকে অন্য কোথাও চলে যেতে চাই।'

'কোথায় যাবেন হুজুর ?'

'আমার বোম্বাই যাওয়ার ইচ্ছে। বিলাত থেকে ফিরে আসার পর এই শহরটা আমার খুব পছন্দ হয়েছিলো। এজন্যে আমি ওখানে থাকবো ঠিক করেছি। তুমি আমার সম্পত্তি বিক্রি করার ব্যবস্থা করো।'

সম্পত্তি বিক্রি করতে এক মাস লেগে যায়। সাড়ে দশ লক্ষ টাকা পাওয়া গেলো। ব্যাঙ্কেও নবাব সাহেবের দু'আড়াই লক্ষ টাকা ছিলো। সম্পত্তি বিক্রিলব্ধ সাড়ে দশ লক্ষ টাকাও ব্যাঙ্কে রেখে দেন। তারপর চাকর-বাকরদের টাকা-পয়সা-বখশিশ দিয়ে বিদায় করে দেন। এবং নিজে স্বয়ং প্রয়োজনীয় কিছু আসবাবপত্র সঙ্গে নিয়ে বোম্বাই রওনা দেন।

বোম্বাই পৌঁছেই তিনি তাজমহল হোটেলে উঠেন। কিন্তু তিনি সব সময়ই একটু খোলামেলা জায়গাতে থাকতেই অভ্যস্ত ছিলেন। তাই কিছুদিন পরই বান্দ্রায় একটা বাড়ী খরিদ করে নেন। তারপর সেটিকে মনের মতো করে সাজিয়ে গুছিয়ে ওখানে বসবাস করতে থাকেন।

দু'এক মাসের মধ্যেই ওখানকার সবার সঙ্গে তাঁর বেশ জানা-শোনা হয়ে যায়। রেডিও ক্লাবের মেম্বারও হয়ে যান—যেখানে সমাজের উঁচু তলার লোকেরা প্রতি সন্ধ্যায় এসে জমায়েত হন, ব্রিজ খেলেন এবং নিজেদের নতুন কারে করে ঘরে ফিরেন।

বাইরের খাবার-দাবার তাঁর ভালো লাগে না। তাই ঘরে তাঁর অভিরুচি অনুযায়ী বিভিন্ন খাবার রান্না করান। বাবুর্চিও পেয়েছিলেন তাঁর মনের মতো। এ কারণে হপ্তায় মধ্যে একবার অন্ততঃ বন্ধু-বান্ধবদের নিজের টেবিলে নেমন্তন্ন করেন তিনি।

একদিন তিনি ভাবলেন, বোম্বাইয়ে খুব ভালো ভালো গভর্নেস পাওয়া যায়। মেয়েরা ঘরের কাজে খুব চটপটে। আর খুব পরিষ্কার-

পরিচ্ছন্নতার সাথে কাজ করে। ওদের কাজের ধরনও বেশ সুন্দর। পুরুষদের তুলনায় ওরা ঘরের দেখাশুনাও ভালো করে।

অতএব তিনি 'টাইমস অফ ইণ্ডিয়া' ছাড়াও আরো কয়েকটি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেন যে, তাঁর একজন ভালো গভর্নেস আবশ্যক।

কয়েকটি দরখাস্ত আসে। তিনি তাদের ইণ্টারভিউও নেন, কিন্তু একজনও তাঁর পছন্দ হলো না। বড় বাজে আর কুৎসিত। সবাই চোখ মটকে হাত নেড়ে নেড়ে কথা বলে।

নবাব সাহেব বড় ভদ্রভাবে তাদের বলেন, 'আমার সিদ্ধান্ত অচিরেই জানাবো। আপাততঃ কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না আমি।

এক এক করে সবাইকে বিদায় দেন। তারপর নবাব সাহেব নিজের হাভানা সিগারে অগ্নি সংযোগ করেন এবং সোফায় বসে সকালের কাগজখানা দ্বিতীয়বার পড়তে শুরু করেন। এ সময় চাকর এসে জানায়, 'আর একজন মেয়ে এসেছে চাকুরীর খোঁজে।'

নবাব সাহেব কাগজখানা তেপায়ার ওপর মুড়ে রেখে দেন। এবং বলেন, 'তাকে ভেতরে পাঠিয়ে দাও।'

মেয়েটি ভেতরে এলো। গোয়ার মেয়ে, তাই তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যেও গোয়ানিজ ছাপ বিদ্যমান। গায়ের রঙ শ্যামলা, মজবুত শরীর, উচ্চতা মধ্যমাকৃতি। ভেতরে প্রবেশ করেই মেয়েটি নবাব সাহেবকে সুন্দর পরিষ্কার উর্দুতে সালাম করে। নবাব সাহেব উঠে দাঁড়ান। তাকে চেয়ার এগিয়ে দেন। ইংরেজী রীতিনীতি আর আবহাওয়ার ওপর কিছু কথাবার্তা বলেন। পরে তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'আপনি এর আগে কি কোথাও কাজটাজ করেছেন?'

মেয়েটি—যার বয়েস ত্রিশের কাছাকাছি হবে—খুব ভদ্র আর মোলায়েম স্বরে জবাব দেয়, 'জী হ্যাঁ, দু'তিন জায়গায় বেশ ভালো পরিবারে কাজ করেছি। তার সার্টিফিকেটও আছে।' বলেই মেয়েটি পার্স খুলে কিছু কিছু কাগজপত্র বের করে। এবং নবাব সাহেবকে দিয়ে বলে, 'আপনি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।'

নবাব সাহেব কাগজগুলোর ওপর হালকাভাবে একটু চোখ বুলিয়ে আবার ফেরত দেন। এবং তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'আপনার নাম?'

'জী, আমার নাম লু জোয়ায়ে।'

'লু জোয়ায়ে আপনার—?'

'জী, ও আমার স্বামী।'

নবাব সাহেব সিগারে একটা লম্বা টান দেন। এবং মিসেস লু জোয়ায়েকে জিজ্ঞেস করেন, 'উনি কি কাজ করেন?'

মিসেস লু জোয়ায়ে জবাব দেয়, 'জী, ও আর্মির সেকেণ্ড লেফটেনেণ্ট ছিলেন। কিন্তু তিন বছর হলো যুদ্ধে মারা গেছেন। এজন্যে আমাকে এ পেশা নিতে হলো।'

সিগারের ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে নবাব সাহেব মিসেস লু জোয়ায়েকে শেষবারের মতো নিরিখ করেন। এবং বলেন, 'আপনি কবে থেকে কাজ শুরু করতে পারবেন?'

'জী, আমি তো এক্ষুণি পারি। কিন্তু আমার আসবাবপত্র তো নিয়ে আসতে হবে। কাল সকালে এসে উপস্থিত হবো।'

'ঠিক আছে। আপাততঃ আপনাকে একশ' টাকা করে দেয়া হবে। কাজ দেখে পরে বাড়ানো যাবে।'

মিসেস লু জোয়ায়ে উপযুক্ত ভাষায় কৃতজ্ঞতা জানায় এবং সালাম করে বিদায় নেয়। আর নবাব সাহেব ভাবতে থাকেন, তাঁর নির্বাচন ভুল নয় তো? কিন্তু তিনি এক মাস পরীক্ষা করে পরের মাসের বেতন চুকিয়ে দিয়ে সহজেই তাকে বিদায় করে দিতে পারবেন।

সকালে মিসেস লু জোয়ায়ে কখন এসেছে নবাব সাহেব টের পাননি। কিন্তু যখন তার ঘুম ভাঙ্গে এবং দরোজায় হালকাভাবে টোকা পড়ে, তখন তিনি ভাবেন, বোধ হয় তার বেয়ারা বেড-টি নিয়ে এসেছে। অতএব তিনি আওয়াজ দেন, 'দরোজা খোলা, ভেতরে এসো।'

দরোজা খুলে মিসেস লু জোয়ায়ে ভেতরে প্রবেশ করে। সকালের সালাম করে। 'বেয়ারা চা নিয়ে আসছে। আমি আপনার স্নান করার জন্য গরম পানি রেখে এসেছি। চা পান করে স্নান সেরে নিন। আমি কাপড়-চোপড় রেডী করছি। আপনার ওয়াড্রোব খোলা তো?'

নবাব সাহেব জবাব দেন, 'হ্যাঁ, খোলা।'

মিসেস লু জোয়ায়ে ওয়াড্রোব খুলে নবাব সাহেবের সমস্ত কাপড়-চোপড় পরীক্ষা করে দেখে। এবং জিজ্ঞেস করে, 'বোধ হয় আজ আপনি গেভার্ডিনের স্যুট পরবেন।'

নবাব সাহেব মুহূর্তের জন্য ভাবেন। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমারও ইচ্ছে এই স্যুট পরা।'

বেয়ারা চা নিয়ে আসে। চা পান করে তিনি স্নানাগারে চলে যান। পরিষ্কার ধবধবে সাদা স্নানাগার আয়নার মতো চকচক করছিলো। ইতিপূর্বে কোনদিন এতো পরিষ্কার দেখা যায়নি। নবাব সাহেব খুশী হন। এমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার পেছনে মিসেস লু জোয়ায়ের হাত আছে ভেবেই তার এই খুশী।

স্নান সেরে বেড রুমে এসে দেখেন, তাঁর প্রয়োজনীয় কাপড়-চোপড় বিছানায় বড় সুন্দরভাবে রাখা। টাইটাও আছে—যেটা তিনি সাধারণতঃ গেভার্ডিনের স্যুটের সাথে পরেন।

কাপড় পরা শেষ হবার সাথে সাথে মিসেস লু জোয়ায়ে এসে উপস্থিত হয়। বলে, 'আসুন, নাস্তা রেডী।'

নবাব সাহেব ডাইনিং রুমে চলে যান। মিসেস লু জোয়ায়ে নিজে নাস্তা সাজিয়েছে। ভালো করে সেঁকা রুটি, পনির, দুধের স্বর, ডিমের পোচ এবং একগ্লাস দুধ।

অল্প ক'দিনের মধ্যে মিসেস লু জোয়ায়ে নবাব সাহেবের বাড়ীতে বেশ প্রভাব বিস্তার করে ফেলে। তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের মন জয় করে নেয়। বন্ধু-বান্ধবদের কে কোন জিনিষ পছন্দ করেন, তাও মিসেস লু জোয়ায়ের জানা হয়ে যায়। মুরগীর কোন অংশ কে পছন্দ করেন, কোন মদ কার পছন্দ—সবই এখন তার নখদর্পণে। সুতরাং যখনি বাড়ীতে কারো নেমন্তন্ন পড়ে, মিসেস লু জোয়ায়ে নিজেই টেবিলে খাবার-দাবার সাজায়। এবং নিজ হাতেই তা পরিবেশন করে।

তার কাজ করার ধরনই আলাদা। একটা আভিজাত্যের ছোঁয়া আছে। এবং সবার সাথে বড় ভদ্র আর অমায়িক ব্যবহার করে। বড় ফুর্তির সঙ্গে চটপট কাজ সেরে নেয়। তাই বলে কাঠবিড়ালীর মতো তাড়াহুড়ো নয়। প্রতিটি কাজই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেরে নেয়।

নবাব সাহেবের বন্ধুরা মিসেস লু জোয়ায়ের প্রশংসা করলে বড় গর্বের সঙ্গে নবাব সাহেব বলেন, 'নির্বাচনটা আমারই। শত শত মেয়ে এসেছিলো, ইণ্টারভিউর জন্য। কিন্তু তাদের মধ্য থেকে ওকেই বেছে নিয়েছি।'

মিসেস লু জোয়ায়ের কাজে ঘরের চাকর-বাকররাও খুশী। কেননা তাদের কাজ অনেক কমে গেছে। অবশ্য রোববার সারাদিনের কাজটা আবার তাঁদের কাঁধে এসে পড়ে। কারণ ওইদিন মিসেস লু জোয়ায়ে ছুটি ভোগ করে। চার্চে যায়, বন্ধু-বান্ধবদের সাথে মিলিত হয়, ছবি দেখে। তারপর কোন বন্ধুর বাসায় রাত কাটিয়ে পরদিন ভোরে আবার ডিউটিতে জয়েন করে।

রোববারে মিসেস লু জোয়ায়ের অভাব গভীরভাবে অনুভব করেন নবাব সাহেব। কিন্তু তিনি বড়ই নীতিবান মানুষ। তিনি চান না কাউকে চব্বিশ ঘণ্টার জন্য গোলাম বানিয়ে রাখতে। মিসেস লু জোয়ায়ে সপ্তাহে যে একদিন ছুটি ভোগ করে, তা তার ন্যায্য পাওনা।

দিনে দিনে মিসেস লু জোয়ায়ে নবাব সাহেব এবং তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের মনের মণিকোঠায় স্থায়ী আসন করে নিতে থাকে। সবাই তার জন্য পাগল। একজন তো সেদিন নবাব সাহেবকে বলেই ফেলেন, 'আমার একটা আর্জি আছে।'

'বলুন।'

'মিসেস লু জোয়ায়েকে যদি আমাকে দিয়ে দেন তাহলে আমি আজীবন আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো। একজন গভর্নেসের খুব দরকার আমার।'

নবাব সাহেব সিগারে একটা টান দেন। তারপর মাথা নেড়ে অস্বীকার করেন। 'না, তা হয় না—এমন গভর্নেস আমি আর পাবো কোথায়?'

তাঁর বন্ধু তোষামোদের ভঙ্গীতে বলেন, 'নবাব সাহেব, আপনার সন্ধানী-দৃষ্টি নিশ্চয়ই এর চেয়ে আরো ভালো গভর্নেস খুঁজে বের করতে পারবে। আমরা তেমন দৃষ্টি কোথায় পাবো?'

নবাব সাহেব সিগারে আরেকটা টান দেন। 'না জনাব, মিসেস

লু জোয়ায়েকে আমি যে কোন মূল্যের বিনিময়েও হাতছাড়া করতে রাজী নই।'

এক রাতে মিসেস লু জোয়ায়ে নবাব সাহেবের স্লিপিং-গাউন ইস্ত্রী করে নিয়ে এলে তিনি তার দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকান। তিনি আজ এতো তাড়াতাড়ি ঘুমোতে চান না। অতএব তাকে বলেন, 'মিসেস লু জোয়ায়ে, আমি আজ একটু দেরী করে ঘুমোবো। আমার মন চাইছে সেকেণ্ড শো'তে কোন ছবি দেখি। আজকাল শহরে ভালো ছবি কোনটা চলছে তোমার মতে?'

মিসেস লু জোয়ায়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলে, 'মিউটিনি অন দি বাউন্টির খুব প্রশংসা শোনা যাচ্ছে—মেট্রোতে ছ'সপ্তাহ হাউস ফুল যাচ্ছে।'

নবাব সাহেব তাকেও আমন্ত্রণ জানান, 'তুমিও সঙ্গে যাবে তো?'

'জী, আপনার অশেষ দয়া। আপনি নিয়ে গেলে যাবো বই কি।'

নবাব সাহেব উঠে মানুষ-প্রমাণ আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ান এবং আপাদমস্তক নিজেকে দেখে মিসেস লু জোয়ায়েকে বলেন, 'তাহলে চলো, খাবার আজ বাইরেই খেয়ে নেবো।'

মিসেস লু জোয়ায়ে বলে 'যদি অনুমতি দেন তাহলে আমি পোশাকটা পাল্টে আসি। এ পোশাকে আপনার সাথে বেরুনোটা আমি ভালো মনে করছি না। বড় জোর দশ মিনিট লাগবে। এক্ষুনি এসে পড়বো।'

কিছুক্ষণ পর সে পোশাক পাল্টে ফিরে আসে। তাকে বড় স্মার্ট দেখাচ্ছিলো। নবাব সাহেব বলেন, 'চলো।'

মিসেস লু জোয়ায়ে আগে আগে হাঁটতে থাকে। বাইরে সদর দরোজার কাছে গিয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়ে। নবাব সাহেব বুঝে ফেলেন, এখন সে নিজেকে আর গভর্নেস বলে মনে করছে না। সে চায় নবাব সাহেব নিজেই যেন দরোজাটা খুলে দেন। যে রকম ইংরেজদের নিয়ম। ওরা সামনে এগিয়ে সমীহ করে মেয়েদের জন্য দরোজা খুলে দেয়।

নবাব সাহেব দরোজা খুলে দেন। মিসেস লু জোয়ায়ে ভেতরে ঢোকে। তারপর নবাব সাহেব। মোটরগাড়ী বাইরে দাঁড়ানো ছিলো। ড্রাইভারও দাঁড়িয়ে। কিন্তু নবাব সাহেব ড্রাইভারকে বিদায় করে দেন। তারপর নিজে ড্রাইভিং সিটে বসে ড্রাইভ করতে শুরু করেন।

মোটর গাড়ী মেরিন ড্রাইভের কাছে এলে নবাব সাহেব মিসেস লু জোয়ায়েকে—যে কিনা চুপচাপ আপন সিটে বসে ছিলো—বলেন, 'কোন হোটেলে খাবো?'

'আমার মতে, এরোজ সিনেমার ওপরে যে হোটেলটা আছে, তাতে খেলে ভালো হবে। ওখানে আপনার পছন্দনীয় খাবারও পাবেন।'

নবাব সাহেব বলেন, 'তুমি ঠিকই বলেছো। আমরা ওপরে বড় নিশ্চিন্ত মনে খাবার খেয়ে—নীচে এরোজ সিনেমার ছবি দেখি না কেন?'

মিসেস লু জোয়ায়ে কিছুক্ষণ ভাবে। 'জী হ্যাঁ,—এরোজ সিনেমাতেও একটা ভালো ছবি চলছে, 'গুড আর্থ'। আমার কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব ছবিটা দেখেছে। বড় প্রশংসা করেছে ওরা ছবিটার—পল মানি নাকি খুব ভালো অভিনয় করেছে।'

নবাব সাহেব আর মিসেস লু জোয়ায়ে এরোজে গিয়ে পৌঁছেন। লিফটের সাহায্যে ওপরে ওঠেন। ডান্সিং হলে একজন বিখ্যাত গায়কের একটি গানের সিম্ফনি বাজানো হচ্ছিলো।

নবাব সাহেব মেনু দেখেন এবং খাবার অর্ডার দেন। বেয়ারা একটু পরই খাবার সার্ভ করে। অবশ্য তার আগে তিনি দু'পেগ হুইস্কি শেষ করেন। মিসেস লু জোয়ায়ের জন্য অর্ডার দেন এক গ্লাস শেরি। এতে তাঁরা দু'জন বেশ একটা হাল্কা আমেজ অনুভব করেন। ডিনার শেষ করতে না করতেই ডান্স শুরু হয়ে যায়। তখনি তার ইংল্যাণ্ডের অতীত দিনের কথা মনে পড়ে যায়। যখন তাঁর মন ছিলো যুবক। তিনি যথারীতি ইংলিশ ডান্স শিখেছিলেন। অতীত দীনের স্মৃতি তাকে বড় উত্তেজিত করে তোলে। তাঁরও ইচ্ছে জাগে কিছুক্ষণ ডান্স করার জন্য। অতএব তিনি মিসেস লু জোয়ায়েকে বলেন, 'আপনি কি আমার পার্টনার হতে পারবেন?'

মিসেস লু জোয়ায়ে জবাব দেয়, 'আমার কোন আপত্তি নেই।'

তাঁরা দু'জন অনেকক্ষণ ধরে নাচতে থাকেন। নবাব সাহেব মিসেস লু জোয়ায়ের পা ফেলার তালে তালে বেশ প্রভাবিত হন।

নাচ শেষ হলে তাঁরা ছবি দেখতে চলে যান এবং শো ভাঙলে তাঁরা বাড়ীমুখো হন। সময়টা ছিলো রাত—মেরিন ড্রাইভের সুপ্রশস্ত রাস্তার একদিকে সমুদ্র—সমুদ্র তীরে গোল গোল আলোর সারি অনেকদূর অবধি চলে গেছে। সমুদ্রের ঠাণ্ডা দমকা হাওয়া তাঁদের দু'জনকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে।

বাড়ী পৌঁছে নবাব সাহেব মিসেস লু জোয়ায়ের জন্য দরোজা খুলে দেন। এবং অনেকটা অনিচ্ছাকৃত ভাবে তার কোমর জড়িয়ে ধরে ভেতরে প্রবেশ করেন। মিসেস লু জোয়ায়ে কোন আপত্তি করে না।

পরদিন অভ্যাসের বিপরীত তিনি ভোর ছ'টায় ঘুম থেকে জেগে ওঠেন। এবং উঠেই তিনি সেগুন কাঠের পালঙ্কের এদিক ওদিক এমনভাবে দেখতে থাকেন যেন তাঁর কোন জিনিষ হারিয়ে গেছে। আর তিনি তা খুঁজে ফিরছেন।

শীতের মওসুম হওয়া সত্ত্বেও তার কপাল ভিজে একাকার হয়ে যায়। তাঁর বালিশের সাথে আরো একটা বালিশ ছিলো—যার ওপর মিসেস লু জোয়ায়ের মাথার চাপ তখনো ফুটে রয়েছে। একি বিশ্রী কাজ করলাম! এ জাতীয় চিন্তা-ভাবনা তার মনমস্তিষ্কে খেলা করতে থাকে। লজ্জা আর অনুতাপের অতল গহ্বরে যেন তলিয়ে যেতে থাকেন নবাব সাহেব।—এ সময় মিসেস লু জোয়ায়ে এসে প্রবেশ করে। এবং যথারীতি শ্রদ্ধার সাথে বলে, 'জনাব, আপনার স্নানের জন্য গরম পানি দিয়ে এসেছি আমি। বেয়ারা আপনার বেড-টি নিয়ে আসছে। বেড-টি পান করে আপনি স্নান সেরে নিন। ততক্ষণে আমি আপনার জন্য কাপড়-চোপড় রেডী করছি।'

নবাব সাহেব স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। এবং বেড-টি পান না করেই স্নানাগারে চলে যান। যেখানে তাঁর জন্য গরম পানি তৈরী।

●

পাঁচ দিন

জম্মু তুবির রাস্তা ধরে কাশ্মীর যাওয়ার পথে কুদ-এর আগে একটা ছোট্ট পাহাড়ী গ্রাম পড়ে। নাম বটুত। খুবই সুন্দর, মনোমুগ্ধকর জায়গা। এখানে যক্ষ্মা রুগীদের জন্যে একটা ছোট সেনিটরিয়াম আছে। এমনিতেই আমি আজ থেকে ন' বছর আগে বটুতে প্রায় তিন মাস থেকে গেছি। এবং এই স্বাস্থ্যকর জায়গার সাথে আমার যৌবনের একটা অপরিণত প্রেমও জড়িয়ে আছে। কিন্তু এই কাহিনীর সাথে আমার কোন রকমের দুর্বলতারই সম্পর্ক নেই।

ছ'সাত মাস হলো আমি বটুতে আমার এক বন্ধুর স্ত্রীকে দেখতে এসেছি। সে এখানে সেনিটরিয়ামে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস গ্রহণ করতে চলেছে। আমি এখানে আসার সাথে সাথে রুগী একজন মারা গেছে। আর বেচীরা পদ্মার শ্বাস-প্রশ্বাস এমনিতেই আটকে ছিলো, এখন আরো অনিশ্চয়তার মধ্যে চলে গেলো। আমি জানি না, কারণ কি। তবে আমার ধারণা এটা নিতান্তই একটা দৈব-দুর্বিপাক ব্যাপার যে, চার দিনের মধ্যে এই ছোট্ট সেনিটরিয়ামে পর পর তিনটি রুগীর মৃত্যু হলো। যখনি কোন বিছানা খালি হতো, কিম্বা সেবা-শুশ্রূষা করতে করতে শ্রান্ত মানুষের ক্লান্ত পরিশ্রান্ত চীৎকার শোনা যেতো, তখনি পুরো সেনিটরিয়ামের ওপর এক অদ্ভুত রকমের উদাসীনতা ছেয়ে যেতো। এবং যে সমস্ত রুগী আশার ক্ষীণ সূত্র ধরে বিছানার সাথে লেপ্টে ছিলো, নিরাশার অথৈ গহ্বরে ডুবে যেতো।

আমার বন্ধুপত্নী পদ্মার তো নাকে দম এসে পড়তো। তার পাতলা ঠোঁট জোড়ায় মৃত্যুর বিবর্ণতা কাঁপতে থাকতো। এবং একটা করুণ অনুসন্ধানী দৃষ্টি জেগে উঠতো। সবার আগে একটা ভয়ার্ত 'কেন?' এবং তারপরে অনেক ভীরু 'না'।

তৃতীয় রুগীর মৃত্যুর পর আমি বাইরে বারান্দায় বসে বসে জীবন

এবং মৃত্যুর ব্যাপারে ভাবছিলাম……। সেনিটরিয়ামকে এ মুহূর্তে আমার কাছে মনে হচ্ছিলো যেন চীনামাটির তৈরী বাসন। যার ভেতরে এসব রুগীরা পেঁয়াজের মতো সিরকার মধ্যে ডুবে আছে। যেসব পেঁয়াজ সিরকার পানিতে ভিজে নরম হয়ে যায়, একটা কাঁটা এসে সেসব পেঁয়াজকে খুঁজে খুঁজে বের করে উঠিয়ে নিয়ে যায়। কেমন হাস্যাস্পদ উপমা! কিন্তু কেন যেন বার বার কেবল আমার এই উপমাটাই মনে পড়ছে। এর বাইরে অন্য কিছু আমি ভাবতে পারছি না যে, মৃত্যুটা একটা বিশ্রী জিনিস…অর্থাৎ আপনি কোন রকমে হয়তো বেঁচে বর্তে আছেন। ব্যাস কোথা থেকে একটা রুগী এসে উপস্থিত হলো, এবং মরে গেলো। গল্প-কাহিনীর দৃষ্টিকোণ থেকেও জীবন কাহিনীর এই পরিণতি খুব একটা যথার্থ মনে হয় না।

বারান্দা থেকে উঠে আমি ভেতরে প্রবেশ করলাম। দশ পনের কদম এগিয়েছি মাত্র, এ সময় পেছন থেকে আওয়াজ এলো, 'বাইশ নম্বরকে দাফন করে এসেছেন?'

ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম, সাদা বিছানার ওপর কালো চোখ জোড়া হাসছে।

এই চোখ জোড়া—পরে জানতে পেরেছি—একজন বাঙালী মহিলার। যে কিনা অন্যান্য রুগীদের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় দিন গুণছে।

সে যখন বললো, 'বাইশ নম্বরকে দাফন করে এসেছেন?' তখন আমার কাছে মনে হলো যেন আমি কোন মানুষকে নয় বরং একটা সংখ্যাকে দাফন করে এসেছি। এবং সত্যি বলতে কি, সেই রুগীটি দাফন করার সময় ঘুণাক্ষরেও আমার মনে স্থান পায়নি যে, ও একটা মানুষ। এবং তার মৃত্যুতে পৃথিবীতে একটা শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে।

আমি আলাপ করার জন্যে যখন বাঙালী মহিলাটির কাছে বসলাম, —যার কালো চোখ জোড়া ভয়ানক অসুস্থতার দরুনও খুব সতেজ আর চকচকে—তখন সে ঠিক তেমনি হেসে বললো, 'আমার নম্বর

চার।' পরে সে নিজের সাদা চাদরের কিছু ভাঁজ হাড্ডিচর্মসার হাত দিয়ে ঠিক করে নিলো। এবং বড় লৌকিকতাহীনভাবে বললো, 'আপনারা পুরুষরা জালানো পোড়ানো আর দাফনে কাফনে বড় আকর্ষণ বোধ করেন।'

আমি এমনি জবাব দিলাম, 'না তা…' এরপরই আমাদের সংক্ষিপ্ত আলাপ-আলোচনা শেষ হলো। এবং আমি বন্ধুর কাছে চলে গেলাম।

পরদিন আমি যথারীতি ভ্রমণ করতে বেরুলাম। হাল্কা দু'এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছিলো। ফলে চার দিকের পরিবেশটা খুব সুন্দর আর পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠলো। অর্থাৎ যেন তাদের সাথে রুগীদের কোন সম্পর্কই নেই—যারা এর ভেতরে কোন রকমে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস গ্রহণ করে যাচ্ছে।……লম্বা লম্বা ঝাউ গাছ, নীল নীল ঝাপসা কুয়াসার ভেতরে শুয়ে থাকা পাহাড়, রাস্তার ওপর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো পাথর, উচ্চতায় বেঁটে অথচ বেশ পুরু মাংশল মোষ, চারদিকেই একটা মনোমুগ্ধকর পরিবেশ…একটা নির্ভরযোগ্য কমনীয়তা, যেখানে চোরেরও কোন ভয় নেই।

ভ্রমণ শেষে আমি সেনিটরিয়ামে প্রবেশ করলাম। তখন রুগীদের ফ্যাকাশে চেহারা দেখে আমি বুঝে ফেললাম, আরো একটা সংখ্যা চলে গেছে। এগারো নম্বর অর্থাৎ পদ্মা।

তার কোটরাগত চোখে যে শূন্যতা বিরাজ করছিলো, তার ভেতর আমি অনেক ভয়ার্ত 'কেন' এবং অনেক ভীরু 'না' জমে আছে দেখতে পেলাম……আহা বেচারী!

বৃষ্টি পড়ছিলো। এজন্যে শুকনো ইন্ধন যোগাড় করা বেশ কষ্টকর হয়ে দাঁড়ালো। যা হোক, শেষ পর্যন্ত গরীব অসহায় মড়াটাকে আগুনের হাতে সোর্পদ করে দেয়া গেলো। আমার বন্ধু ওখানে চিতার পাশেই বসে থাকলো। আর আমি তার মালপত্র ঠিকঠাক করার জন্যে সেনিটরিয়ামে এলাম। ভেতরে প্রবেশ করতেই সেই বাঙালী মহিলাটির কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, 'অনেক দেরী হয়ে গেলো আপনার।'

'জী, বৃষ্টির জন্যে শুকনো ইন্ধন পাচ্ছিলাম না। তাই একটু দেরী হয়ে গেলো।'

'অন্যান্য জায়গায় তো ইন্ধনের দোকান থাকে। তা আমি শুনেছি, এখানে নাকি নিজেকেই ইন্ধন কেটে কেটে যোগাড় করে আনতে হয়।'

'জী হ্যাঁ।'

'একটু বসুন না।'

আমি তার পাশে টুলের ওপর বসে পড়লাম। তখন সে একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করলো, 'খুঁজতে খুঁজতে আপনারা যখন শুকনো লাকড়ি পেয়ে যান তখন খুব খুশী হন, তাই না?'

সে আমার জবাবের অপেক্ষা করলো না। নিজের চকচকে এক-জোড়া চোখ দিয়ে আমাকে গভীরভাবে নিরিখ করতে করতে বললো, 'মৃত্যু সম্পর্কে আপনার কি ধারণা?'

'আমি অনেকবার চিন্তা-ভাবনা করেছি, কিন্তু কিছু বুঝতে পারিনি।'

সে জ্ঞানীর মতো হাসলো এবং ছোট্ট বাচ্চার মতো বলতে লাগলো, 'আমি কিছু বুঝতে পেরেছি……কারণ অনেক মৃত্যু দেখেছি তো……এতো মৃত্যু যে, আপনি বোধ হয় হাজার বছর বেঁচে থাকলেও দেখতে পাবেন না……আমি বাংলা দেশের অধিবাসী, যেখানকার একটা দুর্ভিক্ষ এখনো বিখ্যাত হয়ে আছে……আপনি তো নিশ্চয়ই জানেন। লক্ষ লক্ষ মানুষ সে দুর্ভিক্ষে মারা গেছে……তার ওপর অনেক কাহিনী ছাপা হয়েছে। অনেক অনেক গল্প প্রবন্ধ লেখা হয়েছে। তবুও শুনেছি, মানুষের দুর্ভোগের আসল চিত্র নাকি তুলে ধরা যায়নি……সেই মৃত্যুর খোলা বাজারে আমি মৃত্যু সম্পর্কেই অনেক ভেবেছি।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কি?'

সে তেমনিভাবে জবাব দিলো, 'আমি চিন্তা করে দেখলাম, একজন মানুষ মরে যাওয়া মৃত্যু……কিন্তু একলক্ষ মানুষ মরে যাওয়া একটা তামাশা……সত্যি বলছি। মৃত্যুর যে একটা ভয় কখনো আমার ভেতরে ছিলো, সেটা সম্পূর্ণ দূর হয়ে গেছে……সব সময় যদি দশ বিশটা লাশ আর জানাজা চোখে পড়ে তাহলে মৃত্যুর আসল

আবেদন কি নষ্ট হয়ে যায় না?……আমি শুধু এটুকুন বুঝেছি যে, এরকম পাইকারী মৃত্যুর ওপর কান্নাকাটি করাটাই বেকার……বোকামী ……বিশেষতঃ এতগুলো মানুষের মরে যাওয়াটাই একটা সবচেয়ে বড় বোকামী।'

আমি তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞেস করলাম, 'কার?'

'যারই হোক……বোকামী, বোকামীই……একটা জমজমাট শহরের ওপর আপনি একটা বোমা ফেলুন……মানুষ মরে যাবে…… কোন কুয়োয় বিষ ঢেলে দিন……তার পানি যে-ই পান করবে, সেই মারা যাবে……এসব আকাল, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ এবং রোগশোক সবই বাজে জিনিষ……এর মাধ্যমে মরে যাওয়া অনেকটা ওপর থেকে ছাদ ধ্বসে পড়ে মরে যাওয়ার মতো। কিন্তু মনের একটা নিষ্পাপ ইচ্ছের মৃত্যু অনেক বড় মৃত্যু……মানুষকে মেরে ফেলাটা কিছু না। কিন্তু তার জ্ঞান-বুদ্ধিকে হত্যা করা মহাপাপ।'

এ কথা বলে সে বেশ কিছুক্ষণ চুপ থাকলো। কিন্তু পরে আবার পাশ ফিরে বলতে লাগলো, 'আমার ধ্যান-ধারণা কোন দিনই এ রকম ছিলো না। সত্যি বললে, এসব চিন্তা-ভাবনা করার জ্ঞানই ছিলো না আমার। কিন্তু সেই দুর্ভিক্ষটা আমাকে একটা সম্পূর্ণ নতুন জগতে নিয়ে গিয়ে ফেললো।' হঠাৎ থেমে গিয়ে সে আমার প্রতি মনোযোগী হলো। আমি একটা ছোট্ট নোট বইতে তার কথা টুকে রাখছিলাম।

'কি লিখছেন আপনি?'

আমি সত্য কথাটাই বলে ফেললাম, 'আমি একজন গাল্পিক…… যেসব কথা আমার ভালো লাগে, তা নোট বইতে টুকে রাখি।'

'বাহঃ, তাহলে আমি আপনাকে আমার পরো কাহিনীটাই শুনাবো।'

তিন ঘণ্টা ধরে সে আমাকে দুর্বল স্বরে তার কাহিনী শুনাতে থাকলো। আমি এখন নিজের ভাষায় তা বর্ণনা করছি। অনাবশ্যক বিশ্লেষণে যাবার প্রয়োজন নেই।—বাংলা দেশে দুর্ভিক্ষ যখন চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো, এবং মানুষজনও এদিক ওদিক মরতে থাকলো তখন সকিনাকে তার চাচা এক লম্পটের কাছে পাঁচশ' টাকায় বিক্রি করে

দিলো। লোকটা তাকে লাহোর নিয়ে এলো। এবং একটি হোটেলে তুলে তাকে দিয়ে টাকা রুজি করার চেষ্টা করতে লাগলো। প্রথম পুরুষ হিসেবে তার কাছে যাকে নিয়ে এলো, সে একজন সুস্থ সবল যুবক। দুর্ভিক্ষের আগে, যখন অন্নবস্ত্রের চিন্তা ছিলো না, সে এরকম একজন যুবকের কথাই সব সময় ভাবতো, যে তার স্বামী হবে। কিন্তু এখানে তাকে দিয়ে দেহ-ব্যবসা করানো হচ্ছে। তাকে এমন এক কাজ করতে বাধ্য করাচ্ছে—যার কথা তার কোনদিন ভুলেও মনে পড়লে সে কেঁপে কেঁপে উঠতো।

তাকে যখন কলকাতা থেকে লাহোর নিয়ে এলো, তখনি সে ধরতে পেরেছিলো তার সাথে কেমন ব্যবহার করা হবে। সে খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে। সে ভালো করেই জানে যে, অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই তাকে সওদা বানিয়ে জায়গায় জায়গায় ফেরি করে বেড়াবে। সবকিছুই সে জানে, কিন্তু তবুও সে কয়েদীর মতো আশায় ছিলো—যে কয়েদীর কোন আশা নেই জেনেও আশায় আশায় দিন কাটায়। সকিনা একটা অসম্ভব দুর্ঘটনার প্রতীক্ষায় থাকে……কোন দুর্ঘটনা তো ঘটেনি, তবে তার নিজের মধ্যে হঠাৎ সাহস বেড়ে গেলো এবং সে রাতে কিছুটা নিজের বুদ্ধির জোরে, কিছুটা সেই যুবকটির বোকামীর দরুন সকিনা হোটেল থেকে পালিয়ে যেতে সমর্থ হলো।

এখন তার সামনে পড়ে আছে লাহোরের বিভিন্ন রাস্তাঘাট আর নিত্য নতুন বিপদ। পদে পদে তার কাছে মনে হচ্ছিলো যেন মানুষের লোভাতুর দৃষ্টি তাকে গ্রাস করে ফেলবে। মানুষ তাকে খুব কমই দেখে। কিন্তু তার যৌবনকে—যেটা লুকিয়ে রাখার জিনিষ নয়—এমন গভীর ভাবে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলো যেন শিক দিয়ে শরীর ছিদ্র করে ফেলছে। সোনা-রূপোর কোন অলঙ্কার বা মোতী হতো, তাহলে সম্ভবতঃ সে মানুষের দৃষ্টির হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারতো। কিন্তু সে এমন এক জিনিষের রক্ষণ করছে—যার ওপর যে কেউ অনায়াসে হাত বাড়াতে পারে।

তিন দিন তিন রাত, কখনো এদিকে কখনো ওদিকে সে ঘুরে বেড়াতে থাকলো। ক্ষুধার জ্বালায় তার প্রাণ ওষ্ঠাগত প্রায়, কিন্তু তবু সে

কারো সামনে হাত প্রসারিত করেনি। কেননা তার ভয় ছিলো, সেই প্রসারিত হাত যদি তার সতীত্বকে শুদ্ধ কোন অন্ধ কুঠুরীতে নিয়ে গিয়ে তোলে! দোকানে থরে থরে সাজানো মিষ্টির পশরা দেখতে থাকলো, হোটেলগুলোতে মানুষ বড় বড় অন্নের গ্রাস মুখে তুলে নিচ্ছে। তার চারপাশে খাবার দাবারের কত অপচয় হচ্ছে…… কিন্তু পৃথিবীতে তার ভাগে যেন কোন খাবারই বণ্টন হয়নি।

জীবনে এই প্রথম সে খাবারের প্রতি গুরুত্ব অনুভব করলো। প্রথম দিকে সে খুব খাবার পেতো, এখন সে খাবারকে পাবার জন্য চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু পাচ্ছে না। চারদিনের উপবাস তাকে নিজের দৃষ্টিতে এক বিরাট আত্মত্যাগী তো বানিয়ে দিয়েছে, কিন্তু এখন তার শরীরের মূল ভিত্তিই একেবারে নড়বড়ে হয়ে উঠলো। সে যে আত্মিক একটা প্রশান্তি লাভ করেছিলো, এখন এমন অবস্থার সৃষ্টি হলো যে, তাও আস্তে আস্তে মন থেকে মুছে যেতে থাকলো।

চতুর্থ দিন সন্ধ্যার দিকে সে একটা গলি দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। কে জানে তার কি মনে হলো, হঠাৎ একটা বাড়ীর ভেতরে ঢুকে পড়লো। ঢুকেই তার খেয়াল হলো, যদি কেউ ধরে ফেলে……এবং সমস্ত প্রতিজ্ঞা ভেস্তে যাবে। এখন তার মধ্যে তেমন শক্তিও তো নেই যে…… কিন্তু ভাবতে ভাবতে সে আঙ্গিনায় চলে এলো……আধো অন্ধকারে ঘড়ঞ্চির ওপর (কলসী রাখার নির্দিষ্ট জায়গা) দুটো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কলসী রাখা দেখতে পেলো সে। এবং তার পাশেই বিভিন্ন ফলমূল ভরা দুটো থালায়……আপেল……নাশপাতি……আনার। সে ভাবলো, আনার ফালতু……আপেল আর নাশপাতিই সই। কলসীর ওপরে ঢাকনীর পরিবর্তে একটা পেয়ালা পড়ে ছিলো। সে ঢাকনা তুলে দেখলো ভেতরে মালাইয়ে ভরপুর……সে তুলে নিলো। এবং কোন কিছু চিন্তা-ভাবনা করার সময়ই পেলো না। সে খুব দ্রুত খেতে শুরু করে দিলো। সব মালাই সে খেয়ে ফেললো। কি আরাম, কি শান্তি! সে ভুলে গেলো, এটা অন্যের বাড়ী। সে ওখানেই বসে বসে আপেল আর নাশপাতি খেতে শুরু করলো। ঘড়ঞ্চির নীচে আরো কি যেন ছিলো……সেদ্ধ করা মাংশের ঝোল……ঠাণ্ডা

হয়ে গেছে। কিন্তু সে পুরো পাতিল শেষ করে ফেললো। তারপরই কি যে হলো……পেটের ভেতর একেবারে মোচড় দিয়ে ওঠলো। এবং তার মাথা ঘুরতে লাগলো। সে উঠে দাঁড়ালো। কোথা থেকে যেন কাশির শব্দ ভেসে এলো। সে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলো, কিন্তু মাথা ঘুরে পড়ে গেলো এবং তার চেতনা লোপ পেলো।

চেতনা ফিরে এলে সে নিজেকে একটা পরিষ্কার বিছানায় দেখতে পেলো। সে শুয়ে ছিলো। প্রথমে সে ভাবলো, আমার যথাসর্বস্ব কেউ লুটে নেয়নি তো! পরে সে যখন নিশ্চিত হলো—না সব ঠিক আছে………তখন অন্য চিন্তায় নিমগ্ন হলো। এ সময় হাল্কা কাশির শব্দ ভেসে এলো। একটা হাড্ডির ফ্রেম যেন ভেতরে প্রবেশ করলো।

সকিনা নিজের গ্রামে দুর্ভিক্ষের শিকার অনেক ক্ষুধার্ত মানুষ দেখেছে। কিন্তু এ মানুষ যেন তাদের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। অনাহারতা তার চোখেও আছে, কিন্তু সে অনাহারতার মধ্যে কোন ব্যাকুল আকাঙ্খা নেই। সে ক্ষুধার্ত মানুষ অনেক দেখেছে, যাদের দৃষ্টিতে একটা নগ্ন, বিশ্রী লালসা চক চক করতো। কিন্তু এই লোকটির দৃষ্টিতে এক রকমের একটা পর্দা……একটা অস্পষ্ট পর্দা যেন ঘিরে আছে যার ভেতর দিয়ে লোকটি ভয়ে ভয়ে তার দিকে তাকাচ্ছে।

ভয় পাবার কথা সকিনার, পরিবর্তে লোকটিই যেন ভয় পেয়েছে। সে থেমে থেমে, কিছুটা যেন কাঁদো কাঁদো স্বরে, অনেকটা লজ্জা অনুভব করতে করতে বললো, 'তুমি যখন খাচ্ছিলে আমি তোমার চেয়ে সামান্য কিছু দূরে দাঁড়িয়ে……উঃ! আমি কত কষ্টে যে কাশি রোধ করেছিলাম, যাতে তুমি নিশ্চিন্তে খেতে পারো। আর আমিও এই সুন্দর দৃশ্যটি অনেকক্ষণ ধরে যেন দেখতে পারি। ক্ষুধা বড় প্রিয় জিনিষ। কিন্তু এক আমি যে কিনা ওই প্রিয় জিনিষটি থেকে বঞ্চিত……না……বঞ্চিত বলা উচিত নয়, কেন না আমি নিজেই তো ওটা ধ্বংস করেছি।'

সকিনা কিছুই বুঝতে পারলো না……সে একটা মূর্তিমান হেঁয়ালি যেন, যাকে বুঝে ওঠার আগেই আরেক হেঁয়ালিতে পরিণত হয়। কিন্তু এরপরও সকিনার কাছে তার কথাগুলো খুব ভালো লাগলো—যার

মধ্যে মনুষ্যত্বের উষ্ণ পরশ ছিলো। সুতরাং সে নিজের পুরো জীবন কাহিনীটাই লোকটিকে শুনিয়ে দিলো। সে নীরবে শুনতে থাকলো। কিন্তু তার ওপর যেন কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হলো না। কিন্তু সকিনা যখন তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে লাগলো, তখন তার শুকনো চোখজোড়া পানিতে ভিজে গেলো। এবং সে ভারী স্বরে বললো, 'এখানে থেকে যাও সকিনা……আমি একজন যক্ষ্মা রুগী……আমার কাছে কোন খাবার দাবার……কোন ফলমূলই ভালো লাগে না। তুমি সব খাবে আর আমি কেবল দেখবো……।' কিন্তু পরমুহূর্তেই সে হঠাৎ হাসতে লাগলো, 'কি বোকামী দেখো ……অন্য কেউ শুনলে কি বলতো, অর্থাৎ অন্যে খাবে আর আমি দেখবো……না সকিনা……এমনি আমার একান্ত ইচ্ছে তুমি এখানেই থেকে যাও……'

সকিনা কি যেন চিন্তা করতে লাগলো, 'জী না……অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছিলাম, আপনি এ ঘরে সম্পূর্ণ একা। আর আমি……না না, কথা হলো আমি……'

এ কথা শুনে লোকটি এমন ব্যথা পেলো যে, বেশ কিছুক্ষণের জন্যে যেন কোথায় হারিয়ে গেলো। পরে কথা বললেও মনে হলো যেন কেমন কাঁপা। আমি দশ বছর পর্যন্ত ইস্কুলে মেয়েদের পড়িয়েছি। সব সময় তাদের আমি নিজের মেয়ের মতো মনে করতাম……তুমি……তুমি না হয় আমার আরেকটি মেয়ে হলে।'

এরপর সকিনার বলার আর কিছুই রইলো না। সুতরাং সে অধ্যাপকের বাড়ীতেই রয়ে গেলো।

সে এক বছর কয়েকমাস মাত্র বেঁচে ছিলো। এই ক'দিনে কোথায় সকিনা তার সেবা-শুশ্রুষা করবে, উল্টো অধ্যাপকই তার আরাম আয়েশের জন্যে পুরোপুরি উঠে পড়ে লাগলো। যেন ডাক চলে যাচ্ছে, আর সে তাড়াতাড়ি একখানা চিঠিতে যা কিছু তার মনের কথা লিখে চলেছে……

তার এই মনোযোগ সকিনাকে—যার প্রতি মনোযোগের সত্যি দরকার ছিলো—কয়েক মাসের মধ্যে সুন্দর আকর্ষণীয় করে তুললো। এবার অধ্যাপক ইচ্ছে করেই তার কাছ থেকে কিছুটা দূরে দূরে থাকতে

লাগলো। তবে মনোযোগ তথা আরাম-আয়েশের কোন ত্রুটি রাখলো না।

শেষ দিকে তার অবস্থা হঠাৎ খারাপ হয়ে পড়লো। এক রাতে সে হঠাৎ হড়বড়িয়ে উঠলো। সকিনা তার পাশেই শুয়ে ছিলো। অধ্যাপক জোরে জোরে চীৎকার দিতে লাগলো, 'সকিনা, সকিনা?'

চীৎকার শুনে সকিনা ভয় পেয়ে গেলো। অধ্যাপকের ধ্বসে যাওয়া চোখ জোড়ায় যে পর্দার মধ্যে ছিলো, তা যেন এখন আর নেই। এখন তার ভেতরে এক অথৈ দুঃখ দেখতে পেলো সকিনা। অধ্যাপক কম্পিত হাতে সকিনার হাত ধরলো। এবং বললো, 'আমি মরে যাচ্ছি……কিন্তু এ মৃত্যুর জন্য আমার কোন দুঃখ নেই……কেননা অনেক মৃত্যু আমার ভেতরে জমা হয়ে আছে। তুমি শুনতে চাও আমার কাহিনী……জানতে চাও আমি কে?……শোন……আমি একটা মিথ্যে……মস্তবড় মিথ্যে……আমার সারাটি জীবনই আমি নিজের সঙ্গে মিথ্যে বলতে বলতে এবং তাকে আমার সত্যে রূপ দিতে দিতে কাটিয়ে দিয়েছি……উহঃ কেমন দুঃখজনক, অন্যায় অমানবিক কাজ……আমি একটা ইচ্ছাকে হত্যা করেছি। কিন্তু আমি জানতাম না যে, সে হত্যার পর আমাকে আরো অনেক হত্যা করতে হবে। কিন্তু আমি জানতাম না যে, আমার শরীরের সমস্ত ছিদ্র বন্ধ করে দিতে হবে……সকিনা! আমি এসব যা কিছু বলছি, সবই দার্শনিক প্রলাপ। আসল কথা আমি আমার চরিত্রকে উন্নত করতেই সচেষ্ট ছিলাম। আর নিজে স্বয়ং ময়লা অপবিত্রতার গভীর পাঁকে ডুবে যাচ্ছিলাম। আমি মরে যাবো আর আমার এই চরিত্র……এই রঙচটা ফ্যাকাশে পতাকা আমার কবরের ওপর উড়তে থাকবে……আর যে সমস্ত মেয়েদের আমি ইস্কুলে পড়িয়েছি, তারা যে কোনদিন আমাকে স্মরণ করে তো বলবে, একজন মানুষরূপী ফেরেশতা ছিলো। তুমিও আমার পুণ্যগুলোকে ভুলবে না……কিন্তু আসল কথা এই যে, যেদিন থেকে তুমি এ ঘরে এসেছো……আমি একদিনও তোমাকে চোরের মতো না দেখে থাকতে পারিনি।……আমি কল্পনায় কতবার তোমার ঠোঁটে চুমু খেয়েছি……কতবার তোমার

দু বাহুর মধ্যে আমার মাথা রেখেছি·····কিন্তু প্রতিবারই আমি আবার সেসব কল্পনাগুলোকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছি। তারপর তাকে আবার আগুনে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছি, যেন তার চিহ্নও না থাকে। আমি মরে যাবো······আহা! আমার ভেতর যদি তেমন সাহস থাকতো যে, নিজের উন্নত চরিত্রটাকে লম্বা একটি বাঁশের ওপর ঝুলিয়ে দিতাম। তারপর ডুগডুগি বাজিয়ে মানুষ জমা করে বলতাম—এসো, দেখো এবং শিক্ষা গ্রহণ করো।'

এ ঘটনার পর অধ্যাপক মাত্র পাঁচ দিন বেঁচে ছিলো।······সকিনার বক্তব্য হলো, মৃত্যুর আগে সে বেশ খুশীতে ছিলো। যখন সে শেষ নিঃশ্বাস গ্রহণ করছিলো, তখন সকিনাকে স্রেফ এটুকুন বলেছিলো, 'সকিনা, আমি লোভী নই······জীবনের এই শেষ পাঁচ দিন আমার জন্যে অনেক······আমি তোমার কাছে চির কৃতজ্ঞ।'

●

বোকা

ছেলেমেয়েদের প্রেমিক-প্রেমিকার কথা হচ্ছিলো। প্রকাশ—যে অনেকক্ষণ ধরে নীরবে বসে বসে আপন মনে গভীরভাবে ভাবছিলো—হঠাৎ যেন ফেটে পড়লো, 'সব বোকাস! শতকরা নিরানব্বইজন প্রেমিকাই নেহাত বাজে। দুর্বল আর অসৎ পন্থায় ওরা পটে যায়। বাকী থাকে একজন। এই একজনের ব্যাপারে আপনি কবিত্ব বলেন, বুদ্ধিমত্তা বিচক্ষণতা বলেন, প্রয়োগ করতে পারেন। আমার কাছে অবাক লাগে, তোমরা সবাই অভিজ্ঞ, মধ্যম শ্রেণীর লোকেদের তুলনায় তোমরা অনেক বেশী জ্ঞানী। সত্য তোমাদের কাছে কখনো গোপন থাকে না। এরপরও এটা কোন ধরনের বোকামী যে, তোমরা মেয়েদের মনের প্রবৃত্তিগুলো জাগিয়ে তোলার ব্যাপারে কোমল ও কমনীয় কবিত্ব, সুন্দর মনোমুগ্ধকর দেহসৌষ্ঠব, ভালো পোশাক-আশাক, আতর আরো না জানি কি কি সব অশ্লীল জিনিষপত্রের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিচ্ছো। মেয়েদের সাথে প্রেম করার আগে সবকিছু ভেবেচিন্তে, একটা স্কিম তৈরী প্রয়োজন, এটা আমার দৃষ্টিতে একেবারেই বাতুলতা।'

চৌধুরী জবাব দিলো, 'প্রতিটি কাজ করার আগেই মানুষকে চিন্তা-ভাবনা করতে হয়।'

প্রকাশ তৎক্ষণাৎ বলে উঠলো, 'স্বীকার করি। কিন্তু প্রেম করাটা আমার দৃষ্টিতে কোন কাজই নয়—এটা একটা—এটা একটা—আরে ভাই তুমি চিন্তা করছো না কেন, গল্প লেখা একটা কাজ। শুরু করার আগে তার জন্যে চিন্তা-ভাবনা করার দরকার আছে। কিন্তু প্রেম করা একটা কাজ, এ কথা আপনি কি ভাবে বলছেন—এটা একটা—এটা একটা—আমি বলতে চাচ্ছি, প্রেম করা কোন গৃহ নির্মাণ করা নয় যে, তার জন্যে আগে থেকে একটা নক্শা তৈরী করে নিতে হবে। একটি মেয়ে অথবা নারী হঠাৎ আপনার সামনে এলো। আপনার মনের ভেতর কিছুটা উলটপালট হয়ে গেলো। তারপর আপনার মনে

কামনার জন্ম নিলো এবং আপনি ওর সঙ্গে একই বিছানায় গেলেন। এটাকে আপনি কাজ বলেন ?—এটা একটা—এটা একটা পাশবিক চাহিদা, যেটা পূরণ করার জন্যে পাশবিক পন্থা অবলম্বন করা দরকার। একটি কুকুর যখন একটি কুকুরীর সাথে প্রেম করতে আগ্রহ প্রকাশ করে, তখন সে বসে বসে স্কিম তৈরী করে না। তেমনি ষাঁড় যখন গন্ধ শুঁকে শুঁকে গাভীর কাছে যায়, তখন সে শরীরে আতর লাগাবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। এদিক দিয়ে আমরা সবাই মূলতঃ পশু। এজন্যেই প্রেম-ভালোবাসা তথা পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো চাহিদার ব্যাপারে ভদ্রতা, সভ্যতার ধার না ধারাই উচিত।

আমি বললাম, 'তার মানে কি এই যে, শিল্প সাহিত্য তথা যাবতীয় নন্দন তত্ত্বই একেবারে বেকার!'

প্রকাশ সিগ্রেট ধরালো এবং তেমনি উত্তেজিত ভাষায় বললো, 'একেবারে বেকার নয়—আমি বুঝেছি, তুমি কি বলতে চাচ্ছো। তোমার বক্তব্য হলো, নন্দন তত্ত্বের মূল প্রেরণা নারী, সুতরাং এসব বেকার কি করে হতে পারে।—আসল কথা হলো এ সবকিছুর মূল প্রেরণা নারী নয়, বরং নারীর প্রতি পুরুষের সীমাহীন অনুসন্ধিৎসা। পুরুষ যখন নারীকে নিয়ে ভাবে, তখন সে সবকিছু ভুলে যায়। সে নারীকে নারী হিসেবে ভাবতে চায় না। নারীকে নারী হিসেবে ভাবলে আবেগে আঘাত লাগে। সে নারাকে সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে দেখতে চায়। ইউরোপে, যেখানে মেয়েরা নিত্য নতুন ফ্যাশানের জন্যে পাগল, তাদের গিয়ে জিজ্ঞেস করে এসো, তাদের চুলের, কাপড়ের, জুতোর নিত্য নতুন ফ্যাশান কে আবিষ্কার করে?'

চৌধুরী কোন লৌকিকতার তোয়াক্কা না করেই তার বিশেষ ভঙ্গীতে প্রকাশের কাঁধে মৃদু চাপড় মারলো, 'তুমি বয়ে গেছো দোস্ত—জুতোর ডিজাইন কে বানায়, ষাঁড় গাভীর কাছে যেতে হলে সেণ্ট মাখার কোন প্রয়োজন পড়ে না। এখানে কথা হচ্ছে ছেলেমেয়েদের যে প্রেম ভদ্রভাবে শুরু হয়, সে প্রেমই সাফল্য লাভ করে।

প্রকাশের ঠোঁটের কোণা অবজ্ঞায় কুঁচকে যায়, 'চৌধুরী সাব কেবলা, আপনি একেবারে প্রলাপ বকছেন। রাখুন ভদ্রতা আপনার

সিগ্রেটের ডিব্বায়। আপনি ঈমানে বলুন তো যে মেয়েটির জন্যে আপনি পুরো এক বছর রুমালে সবচে দামী সেণ্ট মেখে স্কিমের পর স্কিম তৈরী করেছিলেন, তাকে কি পেয়েছিলেন?'

চৌধুরী কিছুটা লজ্জিত হয়ে জবাব দিলো, 'না।'

'কেন?'

'সে—সে আরেকজনকে ভালোবাসতো।'

'কাকে—এক হাবাগোবাকে, এক ফেরিওয়ালা ব্যবসায়ীকে—যার না ছিলো গালিবের কোন কবিতা মুখস্থ, না পড়েছিলো কৃষণ চন্দরের কোন গল্প। আপনার তুলনায় সে সেণ্ট মাখা রুমালে নয়, বরং ময়লা লুঙ্গিতে নাক সাফ করতো।'

প্রকাশ হাসলো, 'চৌধুরী সা'ব কেবলা, আমার এখনো ভালো করে মনে আছে, আপনি ওকে বড় কষ্ট করে চিঠি লিখতেন। তার ভেতর আকাশের সমস্ত তারকা কেটে এনে বসিয়ে দিতেন। তার ভেতর চাঁদের সব আলোকরশ্মি ছেঁকে এনে ছড়িয়ে দিতেন। কিন্তু সেই ফেরিওয়ালা ব্যবসায়ীটা আপনার প্রেমিকাকে—যার উন্নত জ্ঞান-বুদ্ধির জন্যে আপনি সব সময় গর্ব করতেন, যার উন্নত মন-মানসিকতার জন্যে আপনি পাগল ছিলেন—চোখ মেরে এক পলকে নিজের থান কাপড়ের গাঁটের ভেতর বেঁধে নিয়ে চলে গেলো। বলুন, এর কি জবাব আছে আপনার কাছে?'

চৌধুরী কাঁচুমাচু করে বললো, 'আমার মনে হয় যে পন্থায় আমি এগুচ্ছিলাম তা ভুল ছিলো। তার মনটা আমি ভালো করে গড়তে পারিনি।'

প্রকাশ হাসলো, 'চৌধুরী সা'ব কেবলা, যে পথে আপনি এগুচ্ছিলেন, সে পথ অবশ্যই ভুল ছিলো। তার মনটা আপনি ঠিকই গড়তে পারেননি। এবং যা কিছু আপনি বলতে চাচ্ছেন তাও ঠিক নয়। কারণ আমার মতে, এসবের কোন প্রয়োজনই ছিলো না, খামাখা আপনি কষ্ট করেছেন। নোট বুক বের করে লিখে নিন, শতকরা একশজনই মধুর দিকে উড়ে আসে, আর শতকরা নিরানব্বইজন মেয়েই কদাকারের প্রতি আকৃষ্ট হয়।'

প্রকাশের কণ্ঠস্বরে এমন এক বিদ্রূপ প্রকাশ পায়, যার লক্ষ্য চৌধুরী নয়, স্বয়ং প্রকাশ যেন।

চৌধুরী জোরে মাথা নেড়ে বললো, 'তোমার এসব দর্শন আমি কোনদিনও বুঝতে পারবো না।'

'চেষ্টা করো এবং বুঝে নাও। এমন কোন কঠিন ব্যাপার তো নয়। আসল ব্যাপার হলো, সরল কথাটাকে তুমি কঠিন করে তুলছো। তুমি শিল্পী। এবং নোট বুক বের করে এটাও লিখে নাও যে, শিল্পীরা নাম্বার ওয়ান বেকুব হয়ে থাকে। তাদের জন্যে আমার বড় করুণা হয়। হতভাগাদের বেকুবীটাও একেবারে নির্ভেজাল হয়ে থাকে। পৃথিবীর সব সমস্যার সমাধান এক নিমেষে করে ফেলবে, কিন্তু কোন মেয়ের মুখোমুখি হলেই বেচারা এমন চক্করে ফেঁসে যায় যে, এক গজ দূরে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটির কাছে যাবার জন্যে পেশোয়ারের টিকেট কেটে ফেলে, তারপর ওখানে গিয়ে ভাবে, মেয়েটি অদৃশ্য হয়ে গেলো কি করে? চৌধুরী সা'ব কেবলা, বের করুন আপনার নোট বুক এবং লিখুন, আপনি এক নম্বর বোকা।'

চৌধুরী চুপ করে রইলো। আর আমার কাছে আবারও মনে হলো যেন প্রকাশ চৌধুরীকে আয়না বানিয়ে তার মধ্যে নিজেকে দেখছে। এবং নিজেকেই গালি দিচ্ছে। আমি তাকে বললাম, 'প্রকাশ, মনে হচ্ছে তুমি চৌধুরীর পরিবর্তে নিজেকেই গালি দিচ্ছো।'

অবিশ্বাস্যভাবে সে জবাব দিলো, 'তুমি একেবারে ঠিক বলেছো। কারণ আমিও একজন শিল্পী। অর্থাৎ আমিও দুই আর দুইয়ে চার হলে খুশী হই না। আমিও কেবলা চৌধুরী সাহেবের মতো অমৃতসরের কোম্পানীবাগে কোন নারীর সাথে মিলিত হয়ে ফ্রন্টিয়ার মেলে করে পেশোয়ার চলে যাই। এবং সেখানে গিয়ে চোখ বড় বড় করে ভাবতে শুরু করি, আমার প্রেমিকা কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলো।' এ কথা বলে প্রকাশ খুব হাসলো। পরে আবার চৌধুরীর উদ্দেশ্যে বললো, 'চৌধুরী সা'ব কেবলা হাত মিলান। আমরা দু'জনই রেসের ঘোড়া। এবং আমাদের এই রেসে একমাত্র সেই জিতবে, যে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে যে, তাকে দৌড়াতেই হবে। কত সময়ে কতটুকু দৌড়ালো সেটা

ভাবতে বসলে চলবে না। এতো সময়ে এতো কদম রাস্তা পার হলে, এতো সময়ে কত কদম পার হবে? প্রেম জিওমেট্রিও নয়, এলজাব্রাও নয়, ব্যাস একটা বাজে জিনিষ। সুতরাং সে প্রেমে যারা পড়ে তাদেরও উচিত বাজে জিনিষের সাহায্য গ্রহণ করা।'

চৌধুরী বিরক্তিমাখা স্বরে বললো, 'কি বাজে প্রলাপ বকছো?'

'তাহলে শোন' প্রকাশ ভালো করে জমে বসলো, 'আমি তোমাদের একটা সত্য ঘটনা শোনাচ্ছি। আমার এক বন্ধু ছিলো, আমি তার নাম বলবো না। বছর দু'য়েক আগে সে একটা প্রয়োজনীয় কাজে চাম্ব গিয়েছিলো। দু'দিন পর ফিরে এসে তার ডিলহোজি যাবার কথা। এবং তার পর পরই তাকে আবার অমৃতসর পৌঁছতে হবে। কিন্তু তিন মাস ধরে সে লাপাত্তা। না দিলো বাড়ীতে একখানা চিঠি, না দিলো আমাকে। পরে সে ফিরে এসে নিজেই জানালো, তিন মাস সে চাম্বেই ছিলো। ওখানকার একটি সুন্দরী মেয়ের সাথে তার প্রেম হয়ে গিয়েছিলো।'

চৌধুরী জিজ্ঞেস করলো, 'নিশ্চয়ই ব্যর্থ হয়েছে?'

প্রকাশের ঠোঁটে অর্থবোধক হাসি ফুটে ওঠলো, 'না—না, সে জয়ী হয়েছে! জীবনে সে একটা দুর্লভ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। তিন মাস সে চাম্বের হাড় কাঁপানো শীতের মধ্যে কাঁপতে থাকলো আর মেয়েটির সঙ্গে প্রেম করতে লাগলো। জিলহোজি ফিরে আসার কথা—এ সময় পাহাড়ী রাস্তার এক পরমা সুন্দরীর সাথে তার চোখাচোখি হয়ে যায়। সারা বিশ্ব-প্রকৃতি যেন কুঁচকে মেয়েটির ভেতরে সেঁটে গেছে। মেয়েটি ফুলে ফেঁপে বিরাট হয়ে গেছে যেন। তার সাথে প্রেম হয়ে গেলো। কেবলা চৌধুরী সাহেব শুনুন, এক নাগাড়ে পনের দিন বেচারা নিজের প্রেমকে বুকের ভেতর লুকিয়ে রেখে বরফমাখা চাম্বের সুবিস্তৃত এলাকায় ঘুরে বেড়ালো আর দূর থেকে মেয়েটিকে দেখলো, কিন্তু কাছে গিয়ে মেয়েটির সঙ্গে দু'টো কথা বলার সাহস হলো না তার। এক একটা দিন যায়, আর সে ভাবে, দূরত্বও কত সুন্দর, কত চমৎকার। উঁচু পাহাড়ের ওপর সে ছাগল চরাচ্ছে। নীচে রাস্তার ওপর তার বুকটা ঢিপ ঢিপ করছে—এই কবিত্বপূর্ণ দৃশ্যটি কল্পনা করে

দেখুন তো, প্রশংসা না করে পারবেন না। এ পাহাড়ে সরলপ্রাণ প্রেমিক দাঁড়িয়ে, ও পাহাড়ে রজতশুভ্রদেহ প্রেমিকা—মাঝখানে রূপোলী পানির ধারা—সুবহানাল্লা, কেমন মনোমুগ্ধকর দৃশ্য—চৌধুরী সা'ব কেবলা……'

চৌধুরী বাধা দিয়ে বললো, 'বাজে বকো না, যা ঘটনা তাই বলো।'

প্রকাশ হাসলো, 'তাহলে শুনুন, প্রায় পনের দিন পর্যন্ত আমার বন্ধু প্রেমের সুকঠিন আক্রমণের প্রভাব থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লো আর ভাবতে থাকলো—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই স্থান ত্যাগ করে তার চলে যাওয়া উচিত। এই পনের দিনে সে কাগজ কলম নিয়ে তো নয়, তবে মনে মনে বেশ কয়েকবার মেয়েটির প্রতি তার প্রেমের গভীরতা পরিমাপ করে শেষ করেছে। মেয়েটির শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই তার পছন্দসই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, তাকে লাভ করা যায় কি করে! কোন পরিচয়-টরিচয় না দিয়ে সোজা তার সাথে কথা বলা শুরু করবে নাকি? না, মোটেই না। এ কি সম্ভব? সম্ভব নয়ই বা কেন? কিন্তু ধরে নাও, সে মুখ ফিরিয়ে নিলো। জবাব না দিয়েই ছাগল হাঁকাতে হাঁকাতে পাশ কেটে চলে গেলো—তাড়াহুড়োর পরিণাম কোনদিনও ভালো না। কিন্তু তার সাথে কথা না বলে তাকে জয় করা যাবে কি করে? একটা পথ অবশ্য আছে। তা হলো, মেয়েটির মনের ভেতরে তার প্রেমভাব জাগিয়ে তোলা। তাকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করা। হ্যাঁ, এটাই ঠিক। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে আকৃষ্ট কিভাবে করা যায়—হাতের ইশারায়? না, তা অসম্ভব। তা বুঝলেন কেবলা চৌধুরী সা'ব, আমার হিরো এই পনের দিন কেবল এসবই ভাবতে থাকলো। ষোল দিনের দিন আচমকা মেয়েটি কুয়োর ওপর দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে হেসে দিলো। তাতেই আমাদের হিরোর মনটা ভরে গেলো। কিন্তু হাঁটু কাঁপতে লাগলো—এখন সে হাঁটু নিয়ে ভাবতে শুরু করলো। পরে হাসির কথা যখন তার মনে পড়লো তখন হাঁটু ছেড়ে মেয়েটির পায়ের গোছা নিয়ে ভাবতে লাগলো, যেটা ঘাগরার ফাঁক দিয়ে এক নজর দেখেছিলো সে। কেমন সুডোল সুন্দর! তবে সেদিন বেশী দূরে নয়, যেদিন এই সুডোল পায়ের গোছার ওপর মৃদু হাত বুলাবে

সে। এভাবে আরো পনের দিন অতিবাহিত হয়ে গেলো। এদিকে সে হেসে তার পাশ দিয়ে যাওয়া আসা করতে লাগলো, ওদিকে আমাদের হিরো সাহেব তখনো তার স্মিত হাসির রিহার্সাল দিতে থাকলো। সোয়া মাস চলে গেলো। তার প্রেম এখনো ঠোঁটের ওপরই হাসতে থাকলো। শেষে একদিন মেয়েটি নিজেই নীরবতার সিল ভেঙ্গে বড় কমনীয় ভঙ্গীতে তার কাছে একটি সিগ্রেট চাইলো। আর সে সিগ্রেটের পুরো প্যাকেটটাই ওকে দিয়ে দিলো এবং ঘরে এসে সারারাত শিহরণ-জাগানো স্বপ্ন দেখতে থাকলো। পরদিন সে একজন লোককে ডিলহোজি পাঠিয়ে পনের প্যাকেট সিগ্রেট আনিয়ে একটি ছোট ছেলের মারফত মেয়েটির কাছে পাঠিয়ে দিলো। তাকে দূর থেকে সিগ্রেট-গুলো গ্রহণ করতে দেখে মনটা তার আনন্দে ভরে গেলো। আস্তে আস্তে সেই শুভ মুহূর্তগুলোও এসে পড়লো, যখন দু'জনেই পাশে বসে কথা বললো। কেমন কথা! কেবলা চৌধুরী সা'ব, বলুন তো আমার হিরো তার সঙ্গে কি কথা বলতো?'

চৌধুরী বিরক্তিমাখা স্বরে জবাব দিলো, 'আমি কি জানি?'

প্রকাশ হাসলো। 'আমি জানি কেবলা চৌধুরী সা'ব—ঘর থেকে বেরুবার সময়ই সে কথামালার একটা দীর্ঘ ফিরিস্তি তৈরী করতো। তাকে এটা বলবো, ওটা বলবো। যখন সে খালের কাছে কাপড় ধুতে থাকবে তখন আমি আস্তে আস্তে পেছন থেকে গিয়ে তার চোখ চেপে ধরবো। পরে তার বগলের নীচে কাতুকুতু দেবো। কিন্তু তার কাছে গিয়ে চোখ চেপে ধরার কথা, বগলে কাতুকুতু দেয়ার কথা মনে পড়লেই লজ্জায় সে একেবারে মিইয়ে যায়।—কি ছেলেমী!—এবং সে তার থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে বসে থাকে। আর ছাগল ভেড়ার প্রসঙ্গে আলাপ জুড়ে দেয়। অনেক সময় সে ভাবে, কতদিন আর এভাবে ছাগল আর ভেড়ার প্রসঙ্গ তার প্রেমের মাঝে ভিড় জমাতে থাকবে! দু'মাসের ওপর হয়ে গেছে অথচ এখনো তার গা পর্যন্ত স্পর্শ করতে পারেনি সে। পরমুহূর্তে সে আবার ভাবে, স্পর্শ করবে কি করে? একটা অজুহাত তো চাই। পরে আবার তার খেয়াল হয়, কোন অজুহাত খুঁজে নিয়ে স্পর্শ করা একটা বাজে ব্যাপার।

মেয়ের পক্ষ থেকে নীরব সম্মতি থাকা চাই যে, সে তার শরীরের যে কোন অংশ ইচ্ছা করলে স্পর্শ করতে পারবে। এখন নীরব সম্মতির প্রশ্ন এসে পড়লো—সে কি করে জানবে যে, সে নীরব সম্মতি দিয়ে দিয়েছে?—কেবলা চৌধুরী সা'ব, তার খোঁজ নিতে নিতেই আরো পনের দিন কেটে গেলো।'

প্রকাশ একটা সিগ্রেট ধরালো এবং মুখ দিয়ে ধোঁয়া উদগীরণ করতে করতে বললো, 'এর মধ্যে তাদের অনেক কথাবার্তা হয়ে গেছে। কিন্তু সেসব কথাবার্তা আমাদের হিরোর ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে সে মেয়েটির কাছে নিজের উচ্চ বংশের কথা কয়েকবার উল্লেখ করেছে। নিজের লম্পট বন্ধুদের ওপর বেশ কয়েকবার অভিশাপও বর্ষণ করেছে—যারা পাহাড়ী অঞ্চলে এসে গরীব মেয়েদের চরিত্র হনন করে। কখনো চাপা স্বরে অনেকটা ফিস ফিস করে, কখনো উচ্চস্বরে কেবল নিজের চরিত্রের প্রশংসাই করে বেড়ালো সে মেয়েটির কাছে। সুতরাং এখন কি করে মেয়েটির কাছে সে নিজের কামভাব প্রকাশ করে! সহজেই অনুমান করা যায় যে, ব্যাপারটা বড় জটিল হয়ে গেছে। তবে তার প্রেমাবেগে কোন কপটতা নেই। এ কারণেই তার বিশ্বাস, একদিন মেয়েটি নিজেই প্রেমের ঝুলিতে ভরে নিজেকে তার হাওলা করে দেবে। অতএব এই আশায় আশায় আরো কিছুদিন চলে গেলো। একদিন কাপড় ধুতে ধুতে মেয়েটি—যার হাত সাবান গোলা পানিতে ভেজা ছিলো—তাকে বললো, 'তোমার ম্যাচ শেষ হয়ে গেছে? আমার পকেট থেকে বের করে নাও।' পকেটটা মেয়েটির ঠিক ফুলে-ওঠা বুকের ওপরই স্থাপন করা ছিলো। ফলে আমাদের হিরো কিছুটা দ্বিধাদ্বন্দের মধ্যে পড়ে গেলো। মেয়েটি বললো, 'বের করে নাও না!' পরে কিছুটা সাহস সঞ্চয় করে নিজের কম্পিত হাত বাড়িয়ে দিলো সে এবং দুটো আঙ্গুল বড় সাবধানে পকেটে ঢুকিয়ে দিলো। ম্যাচটা খুব নীচে, পকেটের একেবারে গভীরে ছিলো। সে ভয় পেয়ে গেলো, আঙ্গুল অন্য জায়গায় গিয়ে ঠেকবে না তো। এই ভয়ে সে হাতটা বের করে ফেললো। এবং নিজের খালি ম্যাচ থেকে বারুদ বের করে সিগ্রেট

ধরালো। পরে মেয়েটিকে বললো, 'তোমার পকেট থেকে ম্যাচ আর একদিন বের করে নেবো।' এ কথা শুনে মেয়েটি দুষ্টুমী ভরা চোখে তার দিকে তাকালো এবং হেসে দিলো। আমাদের হিরো অর্ধেক মাঠ জয় করে নিলো। বাকী অর্ধেক জয় করার জন্যে নতুন স্কিম খুঁজতে লাগলো……'

'একদিন খুব ভোরে ভোরে নালার ওপারে পাহাড়ের ওপরে মেয়েটি ছাগল চরাচ্ছিলো। নালার এপারে বসে বসে তাই দেখছিলো সে, আর মেয়েটির বুক-পকেটের ওপরের স্ফীত মাল দু'টি বার বার লক্ষ্য করছিলো। এ সময় নীচে রাস্তার ওপর কুয়োর পাশে একখানি লরী এসে থামলো। শিখ ড্রাইভার নীচে নেমে পানি খেলো। তারপর ওপরে মেয়েটির দিকে তাকালো। আমার মনটা জ্বলে ওঠলো। কুয়োর বাঁধানো চত্বরের ওপর দাঁড়িয়ে মবিল অয়েলে একাকার শরীর নিয়ে শিখ ড্রাইভার আবারো একবার সাবিত্রীর দিকে তাকালো এবং নিজের নোংরা হাত তুলে তাকে ইশারা করলো। আমার ইচ্ছে হলো, পাশে পড়ে-থাকা বড় পাথরটা তুলে তার দিকে তাক করে ছুঁড়ে মারি।—ইশারা করার পর সে দুটি হাত মুখের দু'দিকে গোল করে রেখে নেহাত বিশ্রীভাবে চীৎকার দিয়ে উঠলো, 'ও জানি—আমি আসবো? আমার সারা শরীরে আগুন ধরে গেলো। শিখ ড্রাইভার ওপরে উঠতে শুরু করলো। আমার মনটা ভেঙ্গে যেতে লাগলো। কিছুক্ষণ পর দেখি, হারামজাদাটা মেয়েটির সামনে দাঁড়িয়ে। তবে আমার বিশ্বাস, যদি লোকটা কোন রকমের বেয়াদবী করে তাহলে মেয়েটি ছড়ি দিয়ে তাকে এমন মেরামত করে দেবে যে, সারাজীবন মনে রাখবে। আমি সেদিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে তার মেরামতের কথা ভাবছিলাম। হঠাৎ দেখি, ওরা দু'জনই আমার দৃষ্টিসীমা থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। আমি নীচে রাস্তার দিকে ছুটে এলাম। কুয়োর পাশে গিয়ে ভাবলাম, একি বোকামী, কিভাবে অদৃশ্য হয়ে গেলো। কিন্তু পরে খেয়াল হলো, বদমাশটা তাকে ধরে বসেনি তো! এজন্যে তাড়াতাড়ি পাহাড়ের ওপর চড়তে শুরু করলাম। বড় কঠিন চড়াই। জায়গায়

জায়গায় বড় তীক্ষ্ণ ঝাড়-জঙ্গল। ওগুলো ধরে ধরে খুব কষ্ট করে ওপরে উঠতে হয়। অনেক দূর ওপরে উঠে গেলাম। কিন্তু ওদের দু'জনকে কোথাও দেখা গেলো না। হাঁপাতে হাঁপাতে আমি সামনের ঝাড়টা ধরে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলাম। হঠাৎ দেখি, ঝাড়ের ওপাশে সাবিত্রী শুয়ে আছে। আর সেই মোটা বিশ্রী ড্রাইভারটার একরাশ দাড়ী তার চেহারার ওপর ছড়িয়ে আছে। আমার শরীরের সমস্ত লোমকূপ যেন ঝলসে গেলো। ওদের দু'জনকে খুব বিশ্রী একটা গালি দিতে চাইলাম আমি। কিন্তু পরমুহূর্তেই ভাবলাম, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বোকা আমি। তৎক্ষণাৎ আমি নীচে নেমে এলাম এবং বাস ষ্ট্যাণ্ডের দিকে চলে গেলাম………।'

প্রকাশের মাথায় কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম চক চক করতে লাগলো।

বাই বাই

নাম তার ফাতেমা, কিন্তু লোকে ডাকতো ফাতু বলে। বাঁহাল উপত্যকার ওপাশে তার বাবার একখানি পানচাক্কি ছিল।

লোকটা নিতান্তই সাদাসিধা, গোবেচারা। সারাদিন পানচাক্কির কাছে বসে থাকতো। পাহাড়ের পাদদেশে ছোট একটা জায়গা জুড়ে এই পানচাক্কিখানি বসানো হয়েছে। ও দিয়ে ফাতুর বাবার দৈনিক দু'তিন টাকার ব্যবস্থা হয়ে যায়—যা তাদের জন্যে যথেষ্টই বলা চলে। কিন্তু ফাতুর দৃষ্টিতে তা নগণ্য। বেচারীর আবার সাজসজ্জা করার শখ ছিল কিনা। সে চায় পয়সাওয়ালাদের মতো জীবনকে ষোলকলায় উপভোগ করতে।

কাজকাম সে কিছুই করে না। মাঝে মধ্যে বুড়ো বাবার কাজে হাত বাড়ায় মাত্র। আটার প্রতি তার দারুণ বিতৃষ্ণা। কারণ ধূলোর মতো উড়ে উড়ে নাকের ভেতরে প্রবেশ করে জমে যায়। তাই আটা দেখলেই তার বিরক্তি ধরে যায়। বিড় বিড় করতে করতে বেরিয়ে পড়ে ফাতু। খোলা হাওয়ায় একটুক্ষণ বেড়িয়ে নেয়, নতুবা চেনাবের জলে হাত-মুখ ধুয়ে নেয়। এরপর তার স্বস্তি। হাত-মুখ ধোয়ার পর সমস্তটা দেহমন এক অপূর্ব স্নিগ্ধতায় ভরে যায়।

চেনাব তার প্রিয়। খুব ভালবাসে সে চেনাবকে। বান্ধবীদের মুখে শুনেছে এই সাগর, প্রেমের সাগর। এই প্রেমের সাগরেই সোহনী-মোহিনুয়াল হির-রঞ্জার প্রেম প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

সুন্দরী, পরমা সুন্দরী এবং সুগঠিত, দৃঢ় দেহলতার অধিকারিণী ফাতুকে দেখে প্রথম দর্শনেই সে আশ্চর্য। পানচাক্কিওয়ালার মেয়ে সুন্দর সুন্দর দামী পোষাক তো আর পড়তে পারে না। ব্যাস ময়লা সেলোয়ার, উপরে সেলাই করা জামা এবং ওড়না প্রায় না থাকারই মতো —এই হচ্ছে ফাতুর পোষাক।

নজীর শচীতগড় থেকে শুরু করে বাঁহাল, ভদরওয়া, কশতুয়াড়—সব জায়গা ঘুরেছে। কোন জায়গা দেখতে আর ঘুরতে তার বাকী নেই। ফাতুকে দেখে প্রথম দর্শনে সে আশ্চর্য হয়নি। কিন্তু যখন সে দেখলো ফাতুর জামার নীচের তিনটে বোতামই নেই এবং তার যুবতী বুক বড় প্রকটভাবে বাইরে উঁকি মারছে তখনি সে কেমন যেন হয়ে গেলো।

নজীর এ অঞ্চলে এসে যে বিশেষ তথ্যটি টুকে নিল তা হচ্ছে, এখানকার মেয়েরা এমন কামিজ বা কুর্তা পরে—যার নীচের অংশের তিনটি বোতামই থাকে না। তার বুঝে আসে না নীচের বোতামগুলো যায় কোথায়? ওরা জেনেশুনে খুলে দেয়, নাকি ধোপারা খুলে রেখে দেয় তা নজীরের বোধগম্যের বাইরেই থেকে যায়।

ভ্রমণ করতে বেরিয়েই নজীর প্রথম ফাতুকে দেখলো। তিনটি বোতামহীন জামা গায়ে ফাতু এদিক ওদিক ঘুরছে। এবং প্রথম দেখাতেই নজীর ফাতুকে ভালোবেসে ফেললো। সে সুন্দরী, নাক-নকশা তার বড় অপূর্ব। সবচাইতে আশ্চর্যের কথা হচ্ছে, ফাতুর গায়ের রঙ ময়লা হওয়া সত্ত্বেও ফাতু সৌন্দর্যে যেন চক্ চক্ করছিল। তার পোষাক নিতান্তই গান্ধা। কিন্তু নজীরের মনে হলো, এটাই ফাতুর সৌন্দর্যকে আরও অধিকভাবে বিকশিত করছে।

নজীরকে এখানে একজন বাউণ্ডেলের মতোই ধরা যায়। সে এসেছে কাশ্মীরের মনোমুগ্ধকর গ্রাম দেখতে। এবং তিন মাস ধরে এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে বিভিন্ন প্রাকৃতিক শোভা দর্শন করছে।

নজীর কোস্তওয়াড় দেখেছে, ভদরওয়া দেখেছে, কোদ এবং বটুতে কয়েকমাস অবস্থান করেছে, কিন্তু ফাতুর মতো মেয়ে সে কোথাও দেখেনি।

বাঁহালের পানচাক্কির বাইরে ফাতুকে তিনটি বোতামহীন জামায় দেখেই তার একান্ত ইচ্ছে হলো নিজের বোতামগুলোও খুলে ফেলে এবং পরে যেন উপরের বোতামহীন জামা মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।

ফাতুর সাথে মিলিত হওয়া নজীরের জন্যে তেমন কষ্টকর নয়। কারণ ফাতুর বাবা সারাদিন গম, জোয়ার, ভুট্টা ইত্যাদি পিষতেই ব্যস্ত থাকে।

আর লোকটা থাকেও সারাদিন হাসিমুখে। প্রত্যেকের সাথে খোলাখুলি কথা বলা যাদের স্বভাব তাদের ফাঁকি দিতে কতক্ষণ। সুতরাং ফাতুর নৈকট্য লাভ করতে নজীরের একটুও বেগ পেতে হলো না। কিছুদিনের মধ্যেই সে বিভিন্ন উপায়ে সম্পর্ক গড়ে তুললো তার সাথে।

এই সম্পর্কই একসময় প্রেমে রূপান্তরিত হয়। পাশেই চেনাব—যাকে প্রেমের সাগর বলা হয়, এবং যার পানির বিনিময়ে ফাতুর বাবার পানচাক্কি চলে—সেই চেনাবের তীরে বসেই নজীর ফাতুকে আপন হৃদয় চিরে দেখাতে থাকলো—যার ভেতর প্রেম ছাড়া আর কিছুই নেই। ফাতু শুনতে থাকে শুধু—হৃদয়াবেগ সে বোঝে না, সে জানে না আবেগ কি, তাই তার আবেগকে হেসে উড়িয়ে দিতে চায় সে। আসলে ফাতু ছিল সদা হাস্যময়ী। জীবনে সে কখনো কাঁদেনি। তার মা-বাবা প্রায়শঃ গর্বের সঙ্গে বলতো, মেয়ে আমাদের ছোটকালে কখনো কাঁদেনি—এমন কি ভূমিষ্ঠ হবার সময়ও।

নজীর আর ফাতুর প্রেম দিন দিন পূর্ণতার দিকে যেতে থাকে। ফাতুকে দেখলেই নজীর অনুভব করে যেন নিজের হৃদয়ের ছায়া দেখে ফেললো সে আয়নায়। আর ফাতু যেন তার একান্তই ব্যক্তিগত। কারণ সে নজীরকে আদর আপ্যায়নে সেবা যত্নে ভরিয়ে তোলে। এই যে একটা বস্তু—যাকে প্রেম বলে, তা পাওয়ার সৌভাগ্য ইতিপূর্বে ফাতুর জীবনে কখনো হয়নি। ফাতু বড়ই খুশী।

বাঁহালে কোন পত্রিকাই পাওয়া যায় না, তাই নজীরকে বটুত যেতে হয়। ওখানে ডাকের অপেক্ষায় বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকে সে। ডাক এলে তারপর পত্রিকা পড়া শেষ করে সে পানচাক্কি ফিরে আসে। প্রায় দু' মাইল পথ পায়ে হেঁটে ফিরে আসে। এতে কষ্ট হলেও ভাবে, ক্ষতি কি ব্যায়াম তো হলো।

পানচাক্কির কাছে এসে পৌঁছলেই ফাতু কোন না কোন অজুহাত দেখিয়ে বেরিয়ে পড়তো এবং প্রতিদিনের বাঁধাধরা রুটিনমতো উভয়ে চেনাবের তীরে গিয়ে দু'খানা পাথরের ওপর বসে পড়তো।

তারপর এক সময় ফাতু বলতো, 'নজীর আজকের খবর কি শুনাও।'

খবর শোনা তার প্রায় অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। আর নজীর পত্রিকা খুলেই তাকে খবর শুনাতে লেগে যেত। তখন ছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা—অমৃতসর থেকে এ দাঙ্গা শুরু হয়েছিল। শিখরা এখানকার মুসলমানদের অনেকগুলো মহল্লা জালিয়ে ছাই করে দিয়েছিল। নজীর এসব খবর ফাতুকে শুনাতো। আর ফাতু নিজের গেঁয়ো ভাষায় শিখদের গালিগালাজ করতো। নজীর কিছুই বলতো না, শুধু চুপ মেরে থাকতো।

একদিন আকস্মিক খবর এলো—পাকিস্তান এবং হিন্দুস্থান ভাগ হয়ে গেছে। নজীর এসব খবর জানতো। যখন শুনলো, ওরা মানভাদার জোর করে দখল করে নিয়েছে তখন বড় দুঃখ পেল। কিন্তু তার এই দুঃখ ফাতুকে জানতে দিল না।

উভয়ের প্রেমের ভিত এখন বেশ দৃঢ় হয়ে উঠেছে। তাদের এ প্রেমের কথা ফাতুর বাবারও অগোচর নয় এখন আর। সে এই ভেবে অত্যন্ত খুশী যে, তার মেয়ে বেশ ধনী এবং অভিজাত ঘরে যাবে বৌ হয়ে। কিন্তু সে চায় না তার মেয়ে শিয়ালকোট যাক—যেখানকার বাসিন্দা নজীর। তার একান্ত ইচ্ছে নজীরও এখানে থেকে যাক।

বিরাট অর্থশালীর ছেলে নজীর—পানচাক্কির কাছে অনেক খালি জায়গা পড়ে আছে। তাতে ছোট দেখে বাড়ী একটা তৈরী করে স্বামী-স্ত্রী সুখে সংসার গড়ে তুলুক। যখনি মন চায় শ্রীনগর চলে যাক, এমন কি শিয়ালকোট থেকেও বেড়িয়ে আসুক না, কেউ তো আর নিষেধ করছে না। সে তো আর বেশী দূর নয়।

ফাতুর বাবার সাথে সব কথাবার্তা ঠিক করে নেয় নজীর। ফাতুর বাবা নজীরের কথায় দারুণভাবে সন্তুষ্ট, সুতরাং সানন্দে মত দিয়ে দেয়। বাবার সম্মতিতে নজীর প্রথমবারের মতো ফাতুর ঠোঁটে চুমু খায়। আর নিজের হাতে ফাতুর জামার বোতাম লাগিয়ে দেয়।

পরদিনই নজীর বাবাকে পত্র লিখে জানিয়ে দিল যে, সে বিয়ে করছে। মেয়েটি কাশ্মিরী, খুব সুন্দরী, সর্বোপরি সে মেয়েটিকে ভালোবাসে। এক মাস পর্যন্ত পিতা-পুত্রের পত্রালাপ চলতে থাকে।

বাবা শিক্ষিত এবং উদারমনা, সুতরাং ছেলের বিয়েতে মত দিয়ে দেন, যদিও নজীরের বিয়ে তাদেরই বংশের অন্য একটি মেয়ের সাথে পাকাপাকি করে রেখেছিলেন।

বাবা শেষপত্রে ফাতেমার ফটো চেয়ে পাঠিয়েছেন, যাতে আত্মীয়-স্বজনকে দেখাতে পারেন। এবং তারাও ফাতেমার ছবি দেখে যেন অসুন্দরী বলে নাক সিঁটকাতে না পারে। কারণ তিনি ফাতুর সৌন্দর্যের বড় প্রশংসা করেছিলেন।

কিন্তু বাঁহালের মতো দুর্গম স্থানে সে ফাতুর ছবি কোথায় পাবে? ছবি তোলার কোন ব্যবস্থাই এখানে নেই। তার নিজের কাছেও নেই কোন ক্যামেরা। এমন কি বটুত, বা কুন অঞ্চলেও কোন ফটোগ্রাফার নেই।

সৌভাগ্যই বলা যায়—একদিন নজীর দেখলো, শ্রীনগর থেকে একখানি মোটর আসছে। সে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল। আশ্চর্য হয়ে দেখলো, মোটর ড্রাইভ করছে তারই অন্তরঙ্গ বন্ধু রণবীর সিং। জোরে চীৎকার দিয়ে ডেকে উঠলো নজীর, ‘রণবীর, দোস্ত, একটু দাঁড়াও।’

নজীরকে দেখে গাড়ীখানা থামে। উভয় বন্ধুর অনেকদিন পর সাক্ষাত, উল্লসিত হয়ে ওরা পরস্পরকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে নিল। হঠাৎ নজীর দেখলো রণবীরের মোটরে একখানা ক্যামেরা পড়ে আছে। রোলী ফ্লাক্স। তার সাথে অনেকক্ষণ আলাপ-সালাপ করে অবশেষে জিজ্ঞেস করলো, ‘তোমার ক্যামেরায় ফিল্ম আছে?’

রণবীর হেসে বললো, ‘খালি ক্যামেরা আর খালি বন্দুক কি কাজে লাগে? আমার ক্যামেরায় ষোলটি এক্সপোজার এখনো বাকী আছে।’

নজীর তৎক্ষণাৎ ফাতুকে সামনে নিয়ে এলো এবং বন্ধু রণবীরকে বললো, ‘দোস্ত, এর গোটা তিন-চারেক পোজ নিয়ে নাও ভালো করে। আর তুমি বোধ হয় শিয়ালকোট যাচ্ছ, ওখান থেকে প্রিণ্ট, ডেভলাপ করে আমার নামে দু’কপি করে বটুতের ডাক মারফত পাঠিয়ে দেবে।’

গভীর মনোযোগ দিয়ে ফাতুকে দেখলো রণবীর। তার মোটরে

তিন-চারজন রাইফেলধারী সেপাই বসে ছিল।

রণবীর যে জায়গা ফটো তোলার জন্যে বেছে নিয়েছে, ডোগরা সৈন্যরাও তাদের পেছনে পেছনে যেতে থাকলো। নজীর তাদের সাথে যেতে চাইলে সৈন্যরা তাকে বাধা দেয়।

কাশ্মীরে যে তখন তুমুল আন্দোলন চলছে নজীর তা ভালো করেই জানে। হিন্দুস্থান কাশ্মীর দখল করে নিতে চাইছে আর পাকিস্তান তাতে বাধা দিচ্ছে এবং এজন্যেই কাশ্মীরে এত সৈন্যসামন্ত।

ফাতুর ছবি তোলা শেষ করে নজীরের বন্ধু রণবীর মোটরে ফিরে এলো। কিন্তু একবারও সে চোখ তুলে নজীরের দিকে তাকালো না। ফাতু তখন ডোগরা সৈন্যদের হাতের মুঠিতে আবদ্ধ। তারা জোর করে তাকে মোটরে তুলে ফেললো। ফাতু জোরে জোরে চীৎকার দিতে থাকলো। নজীরকে উচ্চস্বরে ডাকতে থাকলো—তাকে সাহায্য করার জন্যে। কিন্তু ডোগরা সৈন্যরা তার দিকে বন্দুক তাক করে দাঁড়িয়ে আছে।

মোটর ষ্টার্ট নিলে নজীর বড় করুণ আর নরম স্বরে বন্ধু রণবীর সিংকে বললো, 'দোস্ত, রণবীর, একি হচ্ছে?'

রণবীর সিং মোটর সামনের দিকে চালিয়ে দিলো। আর মোটরখানা নজীরের সামনে দিয়ে যাবার সময় রণবীর সিং হাত নেড়ে শুধু বললো, 'বাই বাই!'

●

পসারিণী

সোহেল আর জামিল, ওরা দু' বন্ধু, বাল্যবন্ধু। ওদের বন্ধুত্বটাকে মানুষ উপমা হিসেবে দেখে। দু'জনই ইস্কুলে একত্রে পড়াশুনা করেছে। এরপর সোহেলের বাবা এখান থেকে অন্যত্র বদলী হয়ে যান। এবং সোহেল রাওয়ালপিণ্ডি চলে যায়। কিন্তু তবুও ওদের বন্ধুত্ব সুদৃঢ় থাকে। কখনো জামিল রাওয়ালপিণ্ডি চলে যেতো, কখনো সোহেল লাহোর চলে আসতো।

দু'জনের মধ্যে বন্ধুত্ব গাঢ় হবার পেছনে আসল কারণ এই যে, ওরা দু'জনেই সৌন্দর্যের পূজারী, দু'জনেই রূপবান—বড়ই রূপবান। কিন্তু ওরা আর দশটা রূপবান যুবকের মতো দুষ্কৃতিকারী নয়। ওদের মধ্যে কোন খুঁত নেই।

উভয়েই বি. এ. পাশ করে। সোহেল রাওয়ালপিণ্ডির গার্ডেন কলেজ থেকে, আর জামিল লাহোর গভর্নমেণ্ট কলেজ থেকে—ভালো নম্বর পেয়ে বড় কৃতিত্বের সঙ্গে। তারই খুশীতে ওরা বেশ বড়সড় একটা পার্টি দেয়। তাতে জনকয়েক মেয়েও অংশগ্রহণ করে।

ধরতে গেলে জামিল সব মেয়েকেই কমবেশী চেনে। কিন্তু তার মধ্যে একটি মেয়েকে দেখে—যে-কিনা তার একেবারেই অপরিচিত। জামিলের মনে হলো যেন তার তাবৎ স্বপ্নই পুরো হয়ে গেছে। সে মেয়েটির ব্যাপারে—যার নাম জামিলা—খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারে, মেয়েটি সালমারই ছোট বোন। সালমা জামিলের সহপাঠিনী। সালমার তুলনায় জামিলা খুবই সুন্দরী। সালমা চেহারা সুরতে দেখতে নিতান্তই সাদাসিধা মেয়ে। কিন্তু জামিলার প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ আর আকর্ষণীয়। জামিল ওকে দেখেই তার প্রেমে জড়িয়ে পড়ে। তৎক্ষণাৎ নিজের আবেগ অনুভূতির কথা বন্ধুকে জানিয়ে দেয়।

সোহেল ওকে বলে, 'আরে ছাড় দোস্ত, ওই মেয়ের মধ্যে তুমি

কি দেখলে যে, একেবারে লাটিম বনে গেলে।'

জামিলের কাছে খারাপ লাগে। 'তুমি সৌন্দর্যই চেন না। এটা যার যার মনের ব্যাপার। তুমি যদি ওই মেয়ের মধ্যে কোন সৌন্দর্যই দেখতে না পাও তার অর্থ তো এই নয় যে, আমিও দেখবো না।'

সোহেল হেসে ওঠে, 'তুমি রাগ করছো, কিন্তু এরপরও আমি বলতে বাধ্য যে, তোমার ওই জামিলা স্রেফ একটা বরফের পিণ্ড। ওর মধ্যে উত্তাপ নেই বললেই চলে।'

'নারীর অপর নাম উত্তাপ।'

'উত্তাপ সৃষ্টি করে নিতে হয়।'

'বরফ থেকে?'

'বরফও তো উত্তাপ থেকে সৃষ্টি হয়।'

'তোমার এই যুক্তি বড়ই অদ্ভুত। আচ্ছা ভাই, তুমি যা চাও তাই করো। আমি বরং এই পরামর্শই দেবো, ওই মেয়ের চিন্তা মন থেকে দূর করে দাও। কারণ সে তোমার উপযুক্ত নয়। তুমি ওর চেয়েও অনেক বেশী সুন্দর।'

এ নিয়ে দু'জনের মধ্যে হালকা একটা দ্বন্দ্ব বাঁধে বটে কিন্তু সমঝোতাও হয়ে যায়। জামিল সোহেলের পরামর্শ ছাড়া জীবনে এক পাও এদিক ওদিক করে না। সে যখন তার শেষ কথা শুনিয়ে দেয়, অর্থাৎ জামিলকে ছাড়া সে বাঁচতে পারবে না—তখন সোহেল অগত্যা অনুমতি দিয়ে দেয়, যত খুশী বোকামী সে করতে পারে।

সোহেল রাওয়ালপিণ্ডি চলে যায়। জামিল যেহেতু জামিলার প্রেমে বড় বিশ্রীভাবে জড়িয়ে পড়েছে, সুতরাং সে জামিলার কাছাকাছি পৌঁছার জন্যে চেষ্টা তদবির শুরু করে দেয়। কিন্তু বিপদ হচ্ছে, ওর বড়বোন সালমা আবার ওকে প্রেমের দৃষ্টিতে দেখে থাকে।

একারণেই জামিল ওদের বাড়ী যাওয়া-আসা শুরু করলে সালমা বড় খুশী হয়। সে মনে মনে ভাবে, জামিল বুঝি ওর প্রেমাবেগের কথা জানতে পেরেছে। তাই ওর সঙ্গলাভের জন্যেই এখানে আসে। সুতরাং সে অস্পষ্ট শব্দাবলীর মাধ্যমে আকারে ইঙ্গিতে নিজের প্রেম-ভালোবাসার কথা জামিলকে জানাতে শুরু করে দেয়। কিন্তু জামিল

বড় দুঃখিত হয়, চিন্তান্বিত হয়, কি করা যায়।

যখনি সে ওদের বাসায় যায়, সালমা কোন না কোন অজুহাতে ছোটবোন জামিলাকে নিজের কামরা থেকে বের করে দেয়। আর তা দেখে জামিল স্রেফ দাঁতে দাঁত পিষে সহ্য করে যায়।

বেশ কয়েকবার জামিলের মন চাইলো—সালমাকে পরিষ্কার বলে দেয়, কেন সে এখানে আসে। তার প্রতি জামিলের কোন আকর্ষণ নেই, সে বরং তার ছোট বোন জামিলাকেই ভালোবাসে।

খুবই সংক্ষিপ্ত কয়েক পলকের জন্যে জামিলাকে দেখার সৌভাগ্য তার হয়। এবং তখন সে চোখের ভাষায় তার সাথে কথা বলার চেষ্টা করে।

একদিন সে জামিলার ছোট্ট একখানা চিঠি পায়। চিঠিখানার ভাষা এ রকম ঃ

'আমার বোন ভুল বুঝে আছে। আপনি কেন তা দূর করছেন না? আমি জানি, আপনি আমার সাথে মিলবার জন্যেই এখানে আসেন। কিন্তু তার উপস্থিতিতে কোন কথাবার্তা বলা যাবে না। তবে হ্যাঁ, বাইরে যে কোন জায়গায় আপনি বলুন, আমি আসতে পারি।

জামিল বড় খুশী হয়। কিন্তু সে বুঝে উঠতে পারে না, কোন জায়গায় ওরা মিলিত হবে এবং তাকে খবরটাই বা দেয়া যাবে কি করে! সে বেশ কটা প্রেমপত্র লেখে, এবং ছিঁড়ে ফেলে। কারণ ওগুলো পাঠানো আরেক সমস্যা। অনেক চিন্তা-ভাবনার পর জামিল ঠিক করে, সে সালমার সাথেই দেখা করতে যাবে। এবং তখন সুযোগ পেলে জামিলাকেও ইঙ্গিতে ওদের মিলিত হবার জন্যে নির্দিষ্ট স্থানটির কথা জানিয়ে দেবে।

প্রায় একমাস ধরে সে সালমার সাথে দেখা করতে থাকে। কিন্তু জামিলার সাথে কথা বলার কোন সুযোগই পায় না সে। একদিন জামিলা সালমার কামরায় উপস্থিত ছিলো, সালমা ওকে কোন এক অজুহাতে কামরা থেকে বের করে দেয়ার মুহূর্তে জামিল নিতান্তই অসংলগ্নভাবে বিড় বিড় করে বলে উঠল, 'লরেন্স গার্ডেন—পাঁচটায়।'

জামিলা কথাটা শোনে এবং কামরা থেকে বেরিয়ে যায়।

তখনি সালমা বড় অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'এ আপনি কি বললেন?'

'তোমাকেই তো বললাম।'

'কি বললেন?'

'লরেন্স গার্ডেন—পাঁচটায়।'

'হ্যাঁ, আমিও চাই কাল পাঁচটায় তুমি আমার সাথে লরেন্স গার্ডেনে চলো।'

'আমারও বড্ড ইচ্ছে, একদিন পিকনিক হোক।'

সালমা বড় খুশী হয়, এবং তখনি রাজী হয়ে যায়। আগামীকাল বিকেল পাঁচটায় সে জামিলের সঙ্গে অবশ্যই লরেন্স গার্ডেনে যাবে। সেণ্ডউইচ সে খুবই ভালো বানায়। সুতরাং বড় প্রেমমাখা স্বরে বলে সে, 'চিকেন সেণ্ডউইচের ভার আমার ওপরই রইলো।'

সেদিনই বিকেল পাঁচটায় জামিল আর জামিলা লরেন্স গার্ডেনে দু'টি মূর্তিমান সেণ্ডউইচ হয়ে বসে থাকে। জামিল ওর প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা প্রকাশ করলে জামিলা বলে, 'আমি জানি, কিন্তু কি করবো, মাঝখানে যে আপা এসে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।'

'তাহলে এখন কি করা যায়?'

'এভাবে দেখা-সাক্ষাৎও বেশীদিন করা যাবে না।'

'তা ঠিক। স্রেফ আজকের এই সাক্ষাৎকারটার প্রতিদানস্বরূপ কাল বিকেলে আমাকে আবার তোমার আপার সঙ্গে এখানে আসতে হবে।'

'এজন্যেই তো আমি জানতে চাচ্ছি, এর সমাধান কোথায়?'

'তুমি উৎসাহ হারিয়ে ফেলছো না তো?'

'কেন, আপনি আমার কাছ থেকে কি চান? আমি এ মুহূর্তে আপনার সাথে যেতে তৈরী আছি। বলুন, কোথায় যেতে হবে?'

'এতো তাড়াহুড়া করো না—আমাকে একটু ভাবতে দাও।'

'আপনি ভেবেচিন্তে ঠিক করুন।'

'কাল বিকেল চারটায় তুমি যে কোন উপায়েই হোক এখানে চলে

এসো। আমি তোমার প্রতীক্ষায় থাকবো। এরপর আমরা দু'জন রাওয়ালপিণ্ডি চলে যাবো।'

'ঝড় তুফান যাই আসুক, কাল নির্দিষ্ট সময়ে আমি এখানে এসে হাজির হবোই।'

'সঙ্গে অলঙ্কারপাতি নেয়ার দরকার নেই।'

'কেন?'

'আমি নিজে তোমাকে খরিদ করে দিতে পারি।'

'আমি আমার অলঙ্কারপাতি ছাড়তে পারবো না। আপা আমাকে আজ পর্যন্ত তার একটা কানের বালি পর্যন্ত পরতে দেয়নি। আমি কেন তার জন্যে আমার সব অলঙ্কার ছেড়ে যাবো!'

পরদিন সালমা স্যাণ্ডউইচ তৈরীতেই ব্যস্ত থাকে। আর এদিকে জামিলা আলমারী থেকে সব অলঙ্কারপাতি আর ভালো ভালো শাড়ী বের করে সুটকেসে ভরে নেয়। এবং বেরিয়ে পড়ে। কেউ টেরও পায় না। সালমা বসে বসে স্যাণ্ডউইচ তৈরী করতে থাকে আর জামিল ও জামিলা, ওরা দু'জন রেলগাড়ীতে চড়ে রাওয়ালপিণ্ডি চলে যেতে থাকে।

রাওয়ালপিণ্ডি পৌঁছেই জামিল নিজের অন্তরঙ্গ বন্ধু সোহেলের বাসায় গিয়ে ওঠে। সৌভাগ্যক্রমে বাসায় তখন কেউ ছিলো না, ও একা ছিলো। ওর বাবা-মা এবটাবাদ বদলী হয়ে গেছে। জামিলের সঙ্গে বোরখা পরা একজন মহিলা দেখে সোহেল আশ্চর্য হয়। কিন্তু বন্ধুকে এ ব্যাপারে কিছুই জিজ্ঞেস করে না।

জামিল ওকে বলে, 'আমার সাথে জামিলা আছে—ওকে বাগিয়ে নিয়ে এসেছি আমি।'

সোহেল জিজ্ঞেস করে, 'বাগিয়ে নিয়ে আসার কি দরকার ছিলো?'

'সে এক বিরাট কাহিনী—অন্য এক সময় তোমাকে বলবো।' পরে জামিলাকে সম্বোধন করে, 'বোরখা খুলে ফেল এবং এই ঘর নিজের মনে করো। সোহেল আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু।'

জামিলা বোরখা খুলে ফেলে। এবং লাজুক চোখে—যে চোখে অন্য এক আবেগ খেলা করছিলো—সোহেলের দিকে তাকায়। সোহেলের

ঠোঁটে এক অদ্ভুত হাসি ফুটে ওঠে। সে বন্ধুকে বলে, 'এখন তোমার ইচ্ছেটা কি তাই বলো।'

জামিল জবাব দেয়, 'বিয়ে করবো, তবে এক্ষুণি নয়। আমি আজই আবার লাহোর ফিরে যেতে চাই। যাতে ওখানকার অবস্থা জেনে নিতে পারি। হয়তো ইতিমধ্যেই একটা গণ্ডগোল বেঁধে গেছে। আমি ওখানে গিয়ে পোঁছতে পারলেই কেউ আর আমাকে সন্দেহ করবে না। দু'তিন দিন থাকবো। এরই মধ্যে তুমি আমাদের বিয়ের সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেলবে।'

সোহেল এমনি ঠাট্টাচ্ছলে বলে, 'বুদ্ধিমান হয়ে উঠেছো আজকাল।'

জামিল জামিলার দিকে তাকিয়ে হাসে, 'এটা তোমার বন্ধুত্বের সুফল।'

'তুমি কি আজই চলে যাবে?'

জামিল জবাব দেয়, 'এক্ষুণি, এই মুহূর্তে। স্রেফ আমার জীবন সঙ্গিনীকে তোমার হাতে তুলে দেবার দেরী। মনে রেখো, এটা আমার আমানত।'

জামিল তার জামিলাকে সোহেলের হাওলা করে আবার লাহোর ফিরে আসে। এখানে বেশ গণ্ডগোল হয়েছে, অনেক হৈ-চৈ হয়েছে। সে সালমার সাথে দেখা করলে হঠাৎ করে অদৃশ্য হয়ে যাবার জন্যে সালমা ওর বিরুদ্ধে অনুযোগ করে। জামিল ওকে মিথ্যা বলে, 'হঠাৎ সর্দি লেগেছিলো। কিন্তু বড়ই দুঃখের ব্যাপার যে, তোমাকে খবর দিতে পারলাম না। কারণ টেলিফোনটা খারাপ ছিলো। তাছাড়া চাকরটাকেও আম্মা কেন যেন বিদায় করে দিয়েছেন।'

সালমা কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে শেষে জামিলকে জানায় যে, ওর বোন জামিলা কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তার সন্ধান পাওয়া যায়নি। নিজের অলঙ্কারপাতি আর কাপড়-চোপড়ও সঙ্গে করে নিয়ে গেছে। কে জানে, কার সঙ্গে যে পালিয়ে গেলো!

জামিল ওকে সহানুভূতি জানালে সালমা বড় প্রভাবিত হয়। এবং স্থির নিশ্চিত হয় যে, জামিল ওকে সত্যিই ভালোবাসে। ওর

চোখ ফেটে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। জামিল নিছক উদারতার খাতিরে পকেট থেকে রুমাল বের করে জামিলার ভেজা চোখ জোড়া মুছে দেয়। এবং ওর প্রতি কাল্পনিক প্রেম প্রকাশ করে। সালমা কিছু সময়ের জন্যে তার বোনের অন্তর্ধানের দুঃখ ভুলে থাকে।

জামিল যখন স্থির নিশ্চিত হয় যে, ওর প্রতি কেউ সামান্যতমও সন্দেহ পোষণ করছে না, তখন সে ট্যাক্সী চড়ে আবার সোজা রাওয়ালপিণ্ডি এসে পৌঁছে। বড় অস্থিরতার মধ্যে ছিলো সে। লাহোরে তিন দিন ধরতে গেলে একরাশ উদ্বিগ্নতার মধ্যে কাটিয়েছে সে। প্রতিটি মুহূর্তে জামিলার অপরূপ চেহারা ওর চোখের সামনে যেন নাচছিলো।

প্রকম্পিত হৃদয়ে ও বন্ধুর বাড়ী পৌঁছেই জামিলাকে ডাক দেয়। ওর বিশ্বাস ছিলো ডাক শুনেই জামিলা উড়ে চলে আসবে তার কাছে। এবং বুকের সাথে সেঁটে যাবে। কিন্তু জামিল বড় ব্যাকুল হয়ে ছিলো। সে আবারো বলে, 'দোস্ত, জামিলাকে ডাকো!'

সোহেল নিতান্তই সহানুভূতি মাখা স্বরে বলে, 'ও তো সেদিনই চলে গেছে।'

'তার মানে?'

'তুমি ওকে এখানে রেখে যাবার দু'তিন ঘণ্টা পরই ও কোথায় চলে যায়। বোধ হয় ও তোমাকে ভালবাসে না।'

জামিল আবারো লাহোর ফিরে আসে। কিন্তু সালমার মাধ্যমে জানতে পারে, ওর বোন এখনো লাপাত্তা। অনেক খোঁজ করেছে, কিন্তু পাওয়া যায়নি। সুতরাং জামিলকে আবারো রাওয়ালপিণ্ডি যেতে হলো। ওখানেই খোঁজ করবে। এবার সে বন্ধুর বাড়ী না উঠে কোন হোটেলে ওঠাই ভালো মনে করলো। এখান থেকেই সে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করবে। সুতরাং রাওয়ালপিণ্ডির একটি হোটেল কক্ষ ভাড়া নিয়েই সে দেখে, পাশের কক্ষে তার জামিলা সোহেলেরই বাহুবন্ধনে আবদ্ধ।

তৎক্ষণাৎ কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসে জামিল। এবং লাহোর চলে আসে। জামিলার অলঙ্কারপাতি ওর কাছেই ছিলো। বীমা করিয়ে ওগুলো নিজের বন্ধুর কাছে পাঠিয়ে দেয় এবং সঙ্গে সামান্য

ক' লাইনের এক টুকরো চিঠিওঃ 'তোমার সফলতার জন্যে আমি তোমাকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি—জামিলাকে আমার সালাম বলবে।'

পরদিন সে সালমার সাথে দেখা করে। এবার সালমাকে জামিলার চেয়েও অনেক বেশী সুন্দরী মনে হয়। সালমা তখনো বোনের জন্যে কাঁদছিলো। জামিল সালমার চোখে চুমু খায় এবং বলে, 'চোখের পানি অকারণে নষ্ট করো না—উপযুক্ত ব্যক্তির জন্যে ওটা রেখে দাও।'

'কিন্তু ও যে আমার বোন।'

জামিল সামলাকে বিয়ে করে নেয়। ওরা দুজনই বেশ খুশী। গ্রীষ্মকালে মারী গিয়ে ওরা দেখে জামিলার রূপ যৌবন কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। আর কেমন বিশ্রী মেক-আপ করে আছে সে। পিণ্ডি পয়েন্টের ওপর দিয়ে জামিলা এমনভাবে হাঁটছিলো যেন ওকে কোন পসরা বিক্রি করতে হবে।

একখানি পত্র

তোমার দীর্ঘ পত্রখানা পেয়েছি—যেটা আমি দু'বার পড়েছি। অফিসে বসে বসে তার প্রতিটি শব্দ ও অক্ষর নিয়ে আমি গভীর চিন্তা-ভাবনা করেছি। সম্ভবতঃ এ কারণেই আমাকে সেদিন রাত দশটা অবধি অফিসে বসে বসে কাজ করতে হয়েছে। কারণ তোমার চিঠি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতেই সেদিন অনেক সময় পার করে দিয়েছিলাম। তুমি তো জানোই, এই পুঁজিবাদী বিশ্বে শ্রমিক যদি তার নির্দিষ্ট সময়ের মূল্যবান মুহূর্তগুলোকে নিজের জীবনের বিনিময়ে মেপে না দেয় তাহলে সে মজুরী পায় না। কিন্তু সেসব মড়া কান্না কেঁদে আর কি লাভ!

বিকেলে আজিজ সাহেব (আজকাল যার ওখানে আমি উঠেছি) এলেন অফিসে। এবং ঘরের চাবি দিয়ে বললেন, 'আমি এক জায়গায় যাচ্ছি বিশেষ কাজে, ফিরতে একটু দেরী হবে। তাই আমার জন্যে অপেক্ষা না করে তুমি বাসায় চলে যেও।' কিন্তু পরে আবার তাড়াতাড়ি চাবিটা পকেটে পুরে বলতে লাগলেন, 'না, তুমি আমার জন্যে অপেক্ষা করো। আমি দশটার মধ্যেই এসে পড়বো।'

অফিসের কাজ শেষ করতেই রাত দশটা বেজে গেছে। খুব ঘুম পাচ্ছিলো। প্রগাঢ় ঘুম যেন চোখে প্রশান্তির পরশ বুলিয়ে দিচ্ছিলো। মন চাইলো চেয়ারের ওপরই শুয়ে পড়ি।

ঘুম জড়ানো চোখে আমি আজিজ সাহেবের জন্যে এগারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। কিন্তু তিনি এলেন না। শেষে ক্লান্ত হয়ে আমি ঘরের দিকে রওনা দিলাম। আমার ধারণা ছিলো হয়তো এদিক ওদিক হয়ে ঠিকই ঘরে চলে গেছেন। এবং আরামসে শুয়ে আছেন। সুতরাং ধীরে ধীরে আধ মাইল অতিক্রম করে আমি তিন তলায় গিয়ে পৌঁছলাম। এবং অন্ধকারের মধ্যে যখন দরোজা স্পর্শ করলাম, তখন শক্ত লোহার তালার শীতলতাই আমাকে জানিয়ে দিলো, আজিজ সাহেব এখনো আসেননি।

সিঁড়ি ভাঙ্গার সময় আমার ক্লান্ত অবসন্ন শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো প্রশান্তি মাখা নিদ্রার সান্নিধ্য অনুভব করে আরো শিথিল হয়ে পড়লো। তার ওপর হতাশার মুখোমুখি হয়ে আমি আরো দুর্বল হয়ে পড়লাম। অতএব বেশ কিছুক্ষণ ধরে আমি কাঠের সিঁড়ির ওপরই হাঁটুর ভেতর মাথা গুঁজে আজিজ সাহেবের প্রতীক্ষা করতে থাকলাম। কিন্তু তিনি এলেন না। অবশেষে হার মেনে ক্লান্ত পায়ে উঠে দাঁড়লাম আমি। তিন তলা সিঁড়ি ভেঙ্গে নীচে নেমে বাজারের দিকে চলে গেলাম। এবং পায়চারী করতে করতে এক সময় পুলের ওপর গিয়ে দাঁড়ালাম। এই পুলের নীচ দিয়ে রেলগাড়ী যাতায়াত করে। পুলের পাশেই একটা বড় চক আছে। এখানে একটা লাইট পোষ্টের সাথে হেলান দিয়ে প্রায় আধ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকলাম আমি। এবং সামনের আধো আলো আধো অন্ধকারে বাজারের দিকে তাকিয়ে থাকলাম, যাতে ঘরে ফেরার পথেই আজিজ সাহেবকে দেখতে পাই। প্রায় আধ বণ্টা প্রতীক্ষার পর এক সময় লাইট পোষ্টের ওপরের দিকে তাকালাম আমি। মনে হলো যেন কাচের সাদা বাল্বটাও আমার এ অবস্থায় হাসছে। কেন কে জানে!

ক্লান্তি আর গভীর নিদ্রার আবেশে আমার কোমর ভেঙ্গে আসছিলো যেন। ইচ্ছে হলো সামান্য কিছুক্ষণের জন্যে হলেও বসে পড়ি। বন্ধ দোকানের সিঁড়ি বারান্দাগুলোও আমাকে উপবেশন করার জন্যে আহ্বান জানাচ্ছিলো। কিন্তু আমি তাদের সে আহ্বানে সাড়া না দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পুলের ওপরে উঠে ভয়ঙ্কর রেলিংয়ে চড়ে বসলাম। খোলা বাজার নীরব নিস্তব্ধ। বেচাকেনা বন্ধ। মাঝে মধ্যে দূর থেকে আগত গাড়ির হর্ণের করুণ কান্না সে নীরবতার মধ্যে একরাশ কাঁপন জাগিয়ে ওপরের দিকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। আমার সামনে রাস্তার দু'ধারে লম্বা উঁচু লাইট পোষ্টের সারি অনেক দূর অবধি চলে গেছে। মনে হচ্ছে যেন লাইট পোষ্টগুলোও ঘুমের ভারে ক্লান্ত অবসন্ন। লাইট পোষ্টগুলো দেখে বিখ্যাত রুশ কবি মিয়াতুলফ-এর কবিতার কয়েকটি লাইন মনে পড়ে গেলো আমার। কবিতাটা তিনি একটি নিস্তব্ধ রাজপথকে উৎসর্গ করেছেন।

মিয়াতুলফ রাজপথের পাশে ঝলমল-করা আলোক-রশ্মিগুলোকে দেখে বলছেন ঃ

'এসব ছোট ছোট বাতি, আলোক-রশ্মি,
স্রেফ নিজের জন্য চক চক করে।
এরা যা কিছু দেখে, যা কিছু শোনে, কাউকে কিছু বলে না।'

রুশ কবি ঠিকই বলেছেন……। আমার অতি নিকটেই, এই গজ খানেকের ব্যবধানে লাইট পোষ্ট দাঁড়িয়ে, তাঁর ওপর ঝুলছে কাচের বাল্ব। বেশ উজ্জ্বল, কিন্তু আমার বুকের ভেতরে যে ঝড় বইছে, তা থেকে সম্পূর্ণ নির্বিকার। আমার ভেতরে কি ঘটছে সে কি তা জানে?

সিগ্রেট জ্বালাবার জন্যে আমি পকেটে হাত দিলাম, তখনি আমার হাত গিয়ে ঠেকলো তোমার ভারী লেফাফার ওপর। তোমার চিঠির কথা আমার আগেই মনে ছিলো, সুতরাং আমি লেফাফা খুলে বাসন্তী রঙের কাগজ বের করে আবার পড়তে শুরু করে দিলাম। তুমি লিখেছো ঃ কখনো কখনো তুমি শয়তান হয়ে যাও, আবার কখনো তোমাকে ফেরেশতা মনে হয়।—এখানকার দু'তিনজন শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিও আমার সম্পর্কে এই মত প্রকাশ করেছেন। এবং আমারও স্থির বিশ্বাস জন্মে গেছে যে, আমি সত্যিই দ্বৈত চরিত্রের অধিকারী। এর ওপর আমি অনেক ভেবেছি এবং যে ফল লাভ করেছি, তা এভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে ঃ

শৈশব আর কৈশোরে আমি যা কিছু চেয়েছি, তা পূরণ হতে পারেনি। বরং এভাবে বলো, আমার ইচ্ছেগুলো পূরণ করতে গিয়ে অনেক অশ্রু অনেক হা হুতাশ জড়িয়ে আছে। আমি শুরু থেকেই একটু চটপটে আর চঞ্চল প্রকৃতির ছিলাম। আমার মন যদি কোন মিষ্টি খেতে চায়, আর সেই চাওয়াটা যদি সময়মত পূরণ না হয়, তাহলে সেই মিষ্টির প্রতি আমার আর কোন আকর্ষণ বা মজা থাকে না। এজন্যে আমি সব সময় আমার কণ্ঠনালীতে এক রকমের একটা তিক্ততা অনুভব করি। এবং এই তিক্ততা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ার পেছনে যে দুঃখজনক ঘটনাটি সবচেয়ে বেশী দায়ী, তা হলো, আমি যাকে ভালোবেসেছি, যাকে আপন হৃদয়ে স্থান দিয়েছি, সে শুধু আমার

আবেগকেই ক্ষত-বিক্ষত করেনি, বরং আমার এই দুর্বলতার সুযোগে সে অনেক অবৈধ সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নিয়েছে। সে আমার সাথে নানান রকমের ছল-চাতুরি আর প্রতারণা করতে থাকলো। কিন্তু মজার কথা হলো আমি এসব ছল-চাতুরি আর প্রতারণার কথা জেনেও তার সাথে প্রেম করতে থাকলাম। আমি ভালো করেই জানি, সে তার প্রতিটি নতুন চাল সাফল্যজনকভাবে সমাপন করে বড় আনন্দ অনুভব করতো এই ভেবে যে, সে আমাকে বোকা বানিয়েছে। আর আমারও বোকামী দেখো, আমি সবকিছু জেনে-শুনেও বোকা বনতাম।

এ সমস্ত কারণে সবদিক থেকেই আমি যখন হতাশার মুখোমুখি হলাম, অর্থাৎ যাকে আমি মন-প্রাণ দিয়ে কামনা করলাম আর সে আমার সাথে প্রতারণা করলো, তখন মনটাই আমার একেবারে দমে গেলো। নিজেকে মনে হলো মরুভূমিতে ছিটকে-পড়া কোন মৌমাছির মতো, যার চার পাশে মধু আহরণের জন্যে কোন ফুল নেই। কিন্তু এরপরও প্রেম করা থেকে আমি বিরত রইলাম না। তেমনি কেউ আমার আবেগের প্রতিও মূল্য দেয় না। পানি যখন মাথা অতিক্রম করে যায় এবং আমার নামমাত্র বন্ধুদের অকৃতজ্ঞতা আর দুর্ব্যবহার মনে পড়তে থাকে তখন আমার মনের ভেতরে এক রকমের তোলপাড় শুরু হয়ে যায়। আমার আবেগপ্রবণ আর যুক্তিবাদী সত্তার মধ্যে যেন যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।

আমার যুক্তিবাদী সত্তা এসব লোকদের অভিশপ্ত কলংকিত সাহচর্যের অপকারিতা এবং অতীতের বিভিন্ন দুঃখজনক ঘটনা উল্লেখ করে যদি বলতে চায় যে, আগামীতে আমার মনটাকে পাথর বানিয়ে ফেলবো এবং প্রেম-ভালোবাসাকে আজীবনের জন্যে মন থেকে ঝেঁটিয়ে বের করে দেবো, তখন আমার আবেগপ্রবণ সত্তা এসব দুঃখজনক ঘটনাবলীকে অন্য রূপে, অন্য রঙে পরিবেশন করতে করতে আমাকে গর্ববোধ করতে বাধ্য করায় যে, আমি সঠিক পথ অবলম্বন করেছি। তার মতে, ব্যর্থতাই এক রকমের সফলতা। সে চায় আমি যেন প্রেম করে যাই। কেননা ওটাই বিশ্ব-চরাচরের আত্মা। কিন্তু বুদ্ধি-

মান সত্ত্বা আবার এই বিরোধ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। মনে হয় যেন এক অদ্ভুত ঘমের ঘোরে সে বুঝি ঝিমুচ্ছে।

জানি না এই যুদ্ধ কবে, কোন কুক্ষণ থেকে যে শুরু হয়েছে, এখন ওটা আমার জীবনেরই একটা অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দিন হোক, রাত হোক, কয়েক মুহূর্ত অবসর পেলেই আমার বুকের খোলা ময়দানে আমার যুক্তিবাদী সত্ত্বা আর আবেগ প্রবণ সত্ত্বা অস্ত্র হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে যায় এবং যুদ্ধ শুরু করে দেয়। তাদের এই তুমুল যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে কেউ যদি আমার সাথে কথা বলে তখন আমার কণ্ঠস্বরটা স্বভাবতই কিছুটা অন্যরকম হয়ে যায়। আমার কণ্ঠনালী এক অবর্ণনীয় তিক্ততায় ভরে ওঠে। চোখ জোড়া গরম হয়ে যায় এবং শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিকল হয়ে পড়ে। তখন আমার কণ্ঠস্বরটা মোলায়েম করার জন্যে আমি অনেক চেষ্টা করি। কোন কোন সময় আমি সফলও হই। কিন্তু আমার দু'কান যদি অসুন্দর কোন কিছু শুনে অথবা আমি যদি এমন কিছু উপলব্ধি করি, যা আমার মানসিকতার সম্পূর্ণ বিপরীত, তাহলে অবশ্য আমার করার কিছুই থাকে না। আমার হৃদয়ের গভীর থেকে যা কিছুই উঠে আসে, তা মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়। অধিকাংশ সময় আবার এই পরিস্থিতিতে যে শব্দ মুখে এসে পড়ে তা খুবই কড়া, তিক্ততায় ভরা। এই কড়া এবং তিক্তভাবটা আমি তখন খুব একটা উপলব্ধি করতে পারি না। কারণ আমার আন্তরিকতার ব্যাপারে আমি সব সময় উদাসীন থাকি। এবং আমার কাছে মনে হয় যেন কাউকে দুঃখ দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এরপরও যদি আমার বন্ধু-বান্ধব কিম্বা আমার সাথে যারা দেখা করতে আসে তাদের মনে দুঃখ দিয়ে থাকি, তার জন্যে দায়ী আমি নই বরং দায়ী আমার সেই বিশেষ মুহূর্তটি, যে মুহূর্তটিতে আমি উন্মাদপ্রায় হয়ে যাই, কিম্বা তোমাদের ভাষায় 'শয়তান'। সুতরাং এই শব্দটা বড়ই কঠিন। এবং এর সাথে আমার উন্মাদনাকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না।

তোমার ইতিপূর্বেকার চিঠিটা যখন আমার হাতে এসে পৌঁছে,

তখন আমার আবেগপ্রবণ সত্তার উপর যুক্তিবাদী সত্তা জয়লাভ করে। এবং তখন আমি আমার নরম কোমল মনকে পাথরে রূপান্তরিত করার চেষ্টায় নিয়োজিত ছিলাম। আমার হৃদয়ে এমনিতেই আগুন জলছিলো, তার ওপর তোমার চিঠি তেল চড়িয়ে দিলো যেন।

তুমি ঠিকই বলেছ, ‘তোমার হৃদয়টা দুঃখপূর্ণ, যদিও তুমি তাকে ভালো মনে করো না।’ আমি তাকে ভালো মনে করি না কেন? এ প্রশ্নের জবাব হিন্দুস্থানের বর্তমান মানবতা-প্রিয় শাসন ব্যবস্থা, যেখানে মানুষের যৌবনের উপর বার্ধক্যের সীলমোহর এঁটে দেয়া হয়।

আমার হৃদয়টা দুঃখে পরিপূর্ণ। এজন্যে আমি অসুস্থ। এবং সব সময় আমি অসুস্থই থাকি। যতদিন আমার হৃদয়ে দুঃখ থাকবে, আমি শান্তি পাবো না, অস্থির থাকবো। তোমার কাছে এটাকে হয়তো বা অতিশয়োক্তি মনে হতে পারে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হলো, ‘দুঃখ আমার রক্ত কলিজা থেকে নিজের জীবনী শক্তি আহরণ করে নিচ্ছে। এমন একদিন আসবে হয়তো, কেবল দুঃখই দুঃখ থাকবে, তোমার বন্ধুকে আর খুঁজে পাবে না। এ পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাবে। আমি প্রায়শঃ ভাবি, দুঃখের এই আবেগ আমাকে কত ভয়ানক ভয়ানক দুঃখ দিয়েছে! আমার যৌবনের দিনগুলো বার্ধক্যের বিষণ্ণ রাতে পাল্টে যাওয়াটাই বা কম কিসের। এবং এসব চিন্তা-ভাবনা করে আমি অবশেষে স্বীকার করতে বাধ্য হই যে, আমার মনটাকে সত্যিই পাথর বানিয়ে ফেলা উচিত। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, এই দুঃখ আমাকে এমন দুর্বল করে ফেলেছে যে, তা আমার পক্ষে কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। এবং যেহেতু আমার পক্ষে সম্ভব নয়, এজন্যে আমার মন-মানসিকতায় এক অদ্ভুত করুণ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

কবিতা এখনো আমি শুদ্ধ করে পড়তে পারি না। কারণ কবিত্বের প্রতি আমি খুব কমই আকর্ষণ বোধ করি। তবে আমার মানসিকতা যে কবিত্বের প্রতি আসক্ত সে সম্পর্কে আমি খুবই সচেতন। নাগরিক কবিদের ছন্দোবদ্ধ কবিতা আমার একদম পছন্দ হয় না। তবে গ্রামের হাল্কা গীত আমাকে খুব আকর্ষণ করে। এসব গীত এতো পরিচ্ছন্ন যে, তার পেছনে লুকিয়ে থাকা হৃদয়ের কাঁপন ধরা পড়ে। আমি

'রোমান্টিক বিমর্ষতা' কি করে লিখতে শুরু করেছি তুমি হয়তো অবাক হচ্ছো, কিন্তু আমি নিজেও কি কম অবাক হচ্ছি!

কিছু কিছু লোক আছে যারা নিজের অনুভূতিগুলোকে অন্যের মুখ দিয়ে প্রকাশ করে নিজের বুকটা খালি করতে চায়। এরা 'প্রতিভাহীন'। এদের প্রতি আমার করুণা হয়। এদের এই প্রতিভাহীনতা অর্থহীনতার চেয়েও দুঃখজনক। আমি অর্থহীন কিন্তু খোদার রহমতে প্রতিভাহীন নই। তা না হলে আমার দুর্দশার অন্ত থাকতো না। আমার কতবড় সান্ত্বনা যে, আমি যা কিছুই অনুভব করি, উপলব্ধি করি, আমার নিজের মুখ দিয়েই, নিজের ভাষাতেই তা প্রকাশ করি

আমার ছোটগল্প নিয়ে আমি কোন দিনই চিন্তা-ভাবনা করিনি। যদি তার মধ্যে কোন কোনটা তোমাদের ভাষায় 'দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল হয়ে থাকে, তাহলে তা আমার সম্পূর্ণ অজান্তেই মনে করতে হবে। ধর্মের প্রতি আমার বিশ্বাস কঠোরও নয়, কোমলও নয়। দু'টোই, আবার কোনটাই নয়। বর্তমান পরিবর্তনশীল যুগে বাস করতে গিয়ে আমার বিশ্বাসও আর এক জায়গায় স্থির নেই। আজ যেটাকে আমি ভালো মনে করছি, কাল সূর্য উঠার সাথে সাথে সেটা অন্যরূপ ধারণ করছে। তার যাবতীয় গুণাবলী দোষে পরিণত হচ্ছে। মানুষের জ্ঞান খুবই সীমিত, আমার জ্ঞান সীমিত হবার সাথে সাথে বিক্ষিপ্তও। এমতাবস্থায় তোমার প্রশ্নের জবাব আমি কি করে দিতে পারি বলো?

আমার ওপর প্রবন্ধ লিখে কি করবে প্রিয়! কলমের কাঁচি দিয়ে তো আমি আমার আবরণকে অনেক আগেই টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলেছি। আল্লার ওয়াস্তে আমাকে আর নগ্ন করো না। আমার মুখের ওপর থেকে পর্দা সরিয়ে নিয়ে তুমি কেবল পৃথিবীকে একটা ভয়ানক মূর্তিই দেখাতে পারবে। আমি হাড্ডির একটা ফ্রেম মাত্র। যার ওপর আমার কলম কখনো কখনো পাতলা চামড়ার এই সামান্য আবরণটুকুও খুলে ফেলে, তাহলে আমার মনে হয় যে ভয়ানক দৃশ্য চোখে পড়বে, সম্ভবতঃ তা তোমার পক্ষেও সহ্য করা সম্ভব হবে না।

আমার কাশ্মীরের জীবন! হায়রে আমার কাশ্মীরের জীবন! আমি জানি, আমার জীবনের এই সুন্দর মুহূর্তগুলোর ব্যাপারে অনেক

কথা তোমার কানে গেছে। এসব কথা যাদের মাধ্যমে তোমার কর্ণগোচর হয়েছে, তাদেরও আমি ভালো করে চিনি। এজন্যেই তুমি যে এসব কথা শুনেও এখনো পর্যন্ত আমার ব্যাপারে কোন সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারোনি বলেছো, তাও ঠিক। কিন্তু এরপরও তুমি মোটামুটি একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছো এ কথা বলতে আমি বাধ্য। এবং তাও খুব দ্রুততার সঙ্গে। তুমি যদি আমার যাবতীয় রচনাবলীর ওপর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিতে তাহলে আমার প্রতি তোমার এই ভুল ধারণা জন্ম নিতো না যে, আমি কাশ্মীরে একটি সরল, কোমল মেয়ের মন নিয়ে স্রেফ ছিনিমিনি খেলেছি। প্রিয় বন্ধু, তুমি আমাকে বড় আঘাত দিয়েছো।

উজির কে?—সংক্ষেপে তার জবাব এই হতে পারে, ও একটি পাহাড়ী মেয়ে। যুবতী, এবং পরিপূর্ণ যুবতী। এই পাহাড়ী মেয়েটির সম্পর্কে—যে কিনা আমার জীবন পুস্তকের কিছু পৃষ্ঠা বেশ কয়েকটি সুন্দর চিত্রে পরিপূর্ণ করে দিয়েছে—আমি অনেক কিছু বলে শেষ করেছি।

আমি তাকে নষ্ট করিনি। অবশ্য নষ্ট বলতে তুমি যদি দৈহিক নষ্ট বুঝাও, তাহলে সে নষ্ট ও অনেক আগেই হয়ে গেছে। এবং এখন সে নষ্টের মধ্যেই জীবনের আনন্দ উল্লাস খুঁজে বেড়াচ্ছে। যৌবনের নেশায় উন্মত্ত উজির এই ভুল ধারণা মন-মস্তিষ্কে স্থান দিয়ে বসে আছে যে, নিজের রক্তকে উত্তপ্ত করে তোলার মধ্যেই জীবনের আসল স্বাদ আর মজা। এবং এর জন্যে সে সব সময়ই ইন্ধন খুঁজে বেড়াতো। এই ধ্বংসাত্মক চিন্তাধারা তার মস্তিষ্কে কি করে জন্ম নিলো, এ সম্পর্কে অবশ্য অনেক কথাই বলা যায়। আমাদের সমাজে এমনিতেই দুষ্ট লোকের অভাব নেই, যাদের কাজই কেবল সরল কোমলমতি মেয়েদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলা। আমার মনে হয় উজির তারই শিকারে পরিণত হয়েছিলো, যেটাকে সভ্যতা সংস্কৃতি বলে আখ্যায়িত করা হয়। একটি ছোট্ট পাহাড়ী গ্রাম—যেটা শহরের যাবতীয় কোলাহল থেকে অনেক দূরে হিমালয়ের কোলে অবস্থিত। এখন সভ্যতা আর সংস্কৃতির বদওলতে শহরের সাথে তার পরিচয় করানো হয়েছে। অন্যভাবে বললে, শহরের

ময়লা আবর্জনা সে জায়গায় স্থানান্তরিত হচ্ছে।

খালি শ্লেটে তুমি যা কিছুই লেখ না কেন পরিষ্কার দেখা যাবে, তুমি স্পষ্ট পড়তে পারবে। উজিরের বুকটাও সম্পূর্ণ খালি। জাগতিক চিন্তা-ভাবনা থেকে পবিত্র এবং পরিষ্কার। কিন্তু সভ্যতার কর্কশ হাত তার ওপর যে বিশ্রী দাগের সৃষ্টি করে গেছে, তা তার ভুল আচার-ব্যবহারে, চাল-চলনেই আমার চোখে ধরা পড়েছে।

উজিরদের বাড়ী বা ঝুপড়ী পাহাড়ের ঢালুতে রাস্তার ওপর অবস্থিত। তার মার অনুরোধে আমি প্রতিদিন তার চেয়ে আর একটু ওপরে চড়াই অতিক্রম করে গাছের নীচে মাটিতে সতরঞ্চি পেতে কিছু পড়া-লেখা করতাম। আর উজির সাধারণতঃ আমার পাশেই বসে বসে মোষ চরাতো। যেহেতু আমার মতো লোকের পক্ষে প্রতিদিন হোটেল থেকে সতরঞ্চি বয়ে আনা, আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া এক প্রকার কষ্টকর ব্যাপার ছিলো, তাই আমি ওটা ওদের বাড়ীতেই রেখে যেতাম। একদিন আমার স্নান করতে একটু দেরী হয়ে গিয়েছিলো। আমি কোন রকমে টলতে টলতে পাহাড়ী দুর্গম পথ অতিক্রম করে তাদের বাড়ী এসে পৌঁছলাম সতরঞ্চি নিয়ে যাবার জন্যে। তখন তার বড় বোনের কাছে জানতে পেলাম, উজির সতরঞ্চি নিয়ে আগেই ওপরে উঠে গেছে। এ কথা শুনে আমিও ওপরে চলে এলাম। এবং বড় পাথরটার কাছে—যেটাকে আমি টেবিল হিসেবে ব্যবহার করতাম—এসে পৌঁছলে আমার দৃষ্টি গিয়ে পড়লো উজিরের ওপর। সতরঞ্চি তেমনি আপন জায়গায় বিছানো, আর সে নিজের সবুজ ওড়না পেতে তার উপর শুয়ে আছে।

আমি অনেকক্ষণ পর্যন্ত পাথরের ওপর বসে রইলাম। আমি জানি, সে আসলে ঘুমের ভান করে শুয়ে আছে। তার ধারণা ছিলো, আমি তাকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করবো। আর সে গভীর ঘুমের ভান করে উঠতে একটু দেরী করবে। কিন্তু আমি নিশ্চুপ বসেই রইলাম। বরং নিজের চামড়ার ব্যাগ খুলেই একটা বই নিয়ে তার দিকে পিঠ করে পড়তে শুরু করে দিলাম। প্রায় আধঘণ্টা অতিবাহিত হবার পর সে বাধ্য হয়ে জেগে উঠলো। আড়মোড়া ভেঙ্গে মুখ দিয়ে এক অদ্ভুত শব্দ

বের করলো। আমি বই বন্ধ করে তার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললাম, 'আমি আসার দরুন তোমার ঘুম নষ্ট হয়নি তো!'

উজির চোখ খুলে কণ্ঠস্বরে যথা সম্ভব ঘুমের আমেজ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করতে করতে বললো, 'আপনি কখন এসেছেন?'

'এই মাত্র এসে বসলাম। তুমি ঘুমোও না।'

'না, মড়ার ঘুমের যে কি হলো আজ! কোমরটা সোজা করার জন্যে এখানে একটু শুয়েছিলাম, ব্যাস ঘুম চলে এলো।—দু'ঘণ্টার চেয়ে কি কিছু কম ঘুমিয়েছি!'

ওর ভেজা ঠোঁটে স্মিত হাসি খেলা করতে থাকলো। আর তার চোখ জোড়া দিয়ে যা কিছু প্রকাশ পাচ্ছিল তা আমার এই কলম দিয়ে বর্ণনা করতে অপারগ আমি। বোধ হয় তখন তার মনে এই অনুভূতিটাই কেবল ছটফট করছিলো যে, তার সামনে একজন পুরুষ বসে আছে, আর সে একজন নারী—পরিপূর্ণ যৌবনবতী নারী—জোয়ারে টলমল করা কোন ঝর্ণা।

কিছুক্ষণ পর সে অপ্রয়োজনীয় আলাপচারিতায় মগ্ন হয়ে গেলো এবং আমাকে প্ররোচিত করার চেষ্টা করতে থাকলো। কিন্তু আমি তার মোষ এবং বাচ্চা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার কথা বলে একটা গল্প শোনালাম। যে গল্পে বাচ্চা আর তার মার গভীর প্রেমের কথা উল্লেখ ছিলো। এ গল্প শোনার পর তার চোখে যে প্ররোচনা ছিলো তা শীতল হয়ে গেলো।

আমি ধার্মিক বা সাধক নই, কখনো তার দাবীও করিনি। পাপ-পুণ্য, শাস্তি-পুরস্কার সম্পর্কে আমার ধারণাও অন্যের চেয়ে আলাদা। এবং নিশ্চয় তোমার ধারণার সঙ্গেও আমার ধারণার তফাৎ অনেক। এ মুহূর্তে আমি সে বিতর্কে যেতে চাই না। কারণ এর জন্যে চাই সুস্থির মন আর পর্যাপ্ত সময়। প্রসঙ্গক্রমে একটি ঘটনার উল্লেখ করতে চাই, যার দ্বারা তুমি আমার ধ্যান-ধারণার কিছুটা আভাস পাবে।

কথায় কথায় একবার আমার এক বন্ধুকে বললাম, 'ভরা যৌবনের ওপর যে সৌন্দর্য সে সৌন্দর্য থেকে মানুষ আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে।' এ মত আমি এখনো পোষণ করি। কিন্তু আমার বন্ধু এটাকে স্রেফ

অর্থহীন প্রলাপ বলে উড়িয়ে দেয়। হয় তো বা তুমিও তাই মনে করো। কিন্তু তোমার কাছে আমি আমার মনের কথাটাই বললাম। সে সৌন্দর্য আমাকে কোন দিনই নিজের দিকে আকর্ষণ করে না, যা ভরা যৌবনবতী মেয়েদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। রূপ দেখে আমার চোখ ঝলসে যায় বটে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, রূপ সৌন্দর্য আমার মন মস্তিকে একটা প্রভাব বিস্তার করতে পারলো। উজ্জল চোখ ধাঁধিয়ে দেয়া রঙ কোন দিনই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারে না, যেটা কোমল নরম আর সুন্দর অঙ্গ সৌষ্ঠব পারে। যে সৌন্দর্য ধীরে ধীরে মানুষের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে হৃদয় ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়, সে সৌন্দর্যই আসল সৌন্দর্য। উজ্জল আলোর দাহ হৃদয়ের পরিবর্তে শরীরের ওপর প্রভাব ফেলে। কিন্তু এসব ফালতু বিতর্কে গিয়ে এখন আর কি লাভ?

বলছিলাম, আমি ধার্মিক বা সাধক নই। এবং এ কথা বলার সময় আমি চাপা স্বরে অনেক কিছু স্বীকারও করছি। কিন্তু সেই পাহাড়ী মেয়েটির সাথে দৈহিক মিলনের প্রত্যাশী অনেকেই ছিলো, আমার সাথে তার সম্পর্ক ছিলো মনের ও আত্মার সম্পর্ক। আমি তোমাকে বোধ হয় কথাটা বলিনি যে, মেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে হলে তার মধ্যে ব্যতিক্রমী কিছু থাকা চাই। তার সাথে এমনভাবে মেলামেশা করবে যেন সে তোমাকে অন্যের চেয়ে আলাদা মনে করতে বাধ্য হয়। তোমার হৃদয়ের কম্পন থেকে এমন শব্দ শোনা যেতে হবে—যা তার কাছে সম্পূর্ণ নতুন মনে হবে। এ কথাগুলো আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি।

পুরুষ এবং নারী—এদের পরস্পরের মধ্যে যে সম্পর্ক তা একজন পরিণত মানুষ ভালো করেই জানে। কিন্তু মাফ করবে, সে সম্পর্ক আমার দৃষ্টিতে নষ্ট হয়ে গেছে। সম্পূর্ণরূপে পাশবিক হয়ে গেছে। আমি জিজ্ঞেস করি, পুরুষরা যদি কোন নারীকেই তাদের প্রেমের কেন্দ্র বানাতে চায় তাহলে তার মধ্যে পাশবিকতাকে স্থান দেয়া হয় কেন? এছাড়া কি প্রেম পরিপূর্ণতা পায় না?—দৈহিক পরিশ্রমের নামই কি প্রেম?

উজির সে ভুলটাই করলো। অর্থাৎ সে মনে করেছিলো বুঝি দৈহিক মিলনের নামই প্রেম। এবং আমার ধারণা, যার সাথে সে মিলিত হয়েছিলো সে তাকে ও রকমই শুনিয়েছিলো। আমি তার সাথে পরিচিত হলাম, তার যাবতীয় ধ্যান-ধারণার প্রতিকুলতা সত্ত্বেও আমি তার সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তুললাম। সে তার উৎকৃষ্ট রঙীন স্বপ্নের ব্যাখ্যা খুঁজতে চেষ্টা করলো আমার অস্তিত্বের মাঝে। কিন্তু তাকে হতাশ হতে হলো। কিন্তু যেহেতু ভুল কাজ করা সত্ত্বেও সে ছিলো নেহাত সরল, সেহেতু আমার এসব অকপট কথাবার্তা তার সে হতাশাকে অবাক-বিস্ময়ে রূপান্তরিত করে দিলো। এবং ধীরে ধীরে তার এই অবাক বিস্ময় এমন আকাঙ্খার রূপ পরিগ্রহ করলো যে, সে এই পথে অনেক কিছু জানার সুযোগ পেলো। এই আকাঙ্খা নিশ্চয়ই একটা পূত-পবিত্র নিষ্পাপতায় রূপান্তরিত হয়ে যেতো এবং নিজের নারীত্বের সেই দুর্লভ সম্মান ও আবারো ফিরে পেতো যা সে ভুল পথে গিয়ে হারিয়ে ফেলেছিলো। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার যে, আমাকে সেই পাহাড়ী গ্রাম ছেড়ে আবারো ছল ছল চোখে শহরে ফিরে আসতে হলো।

তাকে আমার প্রায়শঃ মনে পড়ে কেন? এ জন্যে যে, বিদায় নেয়ার সময় তার হাস্যময় কাতর দু'টি চোখে দু'ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়েছিলো। সে আমার আবেগ অনুভূতি দ্বারা বেশ প্রভাবিত হয়েছিলো, এবং প্রকৃত প্রেমের ছোট্ট এক টুকরো কিরণ তার বুকের গভীরে বাসা বেঁধেছিলো বুঝা যায়। আহা আমি যদি উজিরকে প্রেমের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য দিয়ে আলোকিত করে তুলতে পারতাম। এবং কে জানে সেই পাহাড়ী মেয়েটিও হয়তো আমাকে সবকিছু দিয়ে ভরিয়ে তুলতে পারতো, যার খোঁজে আমার যৌবন বার্ধক্যের স্বপ্ন দেখছে।

এই হলো আমার কাহিনী, যার মধ্যে, তোমার ভাষায়, মানুষ আকর্ষণীয় উপাদান খুঁজে বেড়ায়। তুমি জানো না, এবং অন্যেরাও জানে না আমি কেন এসব কাহিনী লিখি—অন্য এক সময় বুঝাবো।

মুতরী

কংগ্রেস হাউজ এবং জিন্না হল থেকে সামান্য কিছু দূরে একটি প্রস্রাবখানা আছে। সেটাকে বোম্বের লোকেরা মুতরী বলে। আশেপাশের বিভিন্ন মহল্লার যাবতীয় ময়লা আবর্জনা সেই দুর্গন্ধময় কুঠুরীর বাইরে সব সময় স্তূপাকারে পড়ে থাকে। এমন দুর্গন্ধ ছড়ায় যে, মানুষকে নাকে রুমাল চাপা দিয়ে বাজার থেকে ফিরতে হয়।

একবার বড় অপারগ হয়ে তাকে সেই মুতরীতে প্রবেশ করতে হয়—পেচ্ছাব করার জন্যে। নাকে রুমাল চেপে শ্বাস বন্ধ করে সেই দুর্গন্ধময় স্থানটিতে প্রবেশ করে। সারা মেঝেতে ময়লা-আবর্জনা বুদ্বুদের মতো ফুটে রয়েছে। দেয়ালগুলোতে মানুষের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ছবি বড় বিশ্রীভাবে চিত্রিত করে রেখেছে। সামনে কয়লা দিয়ে কে যেন লিখে রেখেছে—'মুসলমানো কি বহেন কা পাকিস্তান মারা'।

শব্দগুলো দুর্গন্ধের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দেয় যেন। সে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসে।

জিন্না হল এবং কংগ্রেস হাউজ দুটোই সরকারের দখলে, কিন্তু তার সামান্য দূরে যে মুতরী অবস্থিত—তা সম্পূর্ণ বেদখলে যেন নিজের যাবতীয় দুর্গন্ধ ছড়াবার জন্যেই। আশেপাশের বিভিন্ন ময়লা পচা-আবর্জনা এখন আরো বেশী জমতে দেখা যায়।

আর একবার তাকে বাধ্য হয়ে সেই মুতরীতে যেতে হলো। পেচ্ছাব করতে তা বলাই বাহুল্য। নাকে রুমাল চেপে শ্বাস বন্ধ করে সেই কুঠুরীতে প্রবেশ করলো। মেঝেতে পাতলা পায়খানার ছোট ছোট রুটি যেন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। দেয়ালে দেয়ালে মানুষের বংশ বৃদ্ধি করার অঙ্গের সংখ্যা যেন আরো অনেক বেড়ে গেছে। 'মুসলমানো কি বহেন কা পাকিস্তান মারা'-এর নীচে কে যেন মোটা পেন্সিল দিয়ে ঘন শব্দ ক'টা লিখে দিয়েছে—'হিন্দুও কি মা কা অখণ্ড হিন্দুস্থান মারা'।

লেখাটা মুতরীর দুর্গন্ধের মধ্যে যেন কড়া এসিডের উগ্রতা এনে দেয়। সে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসে।

মহাত্মা গান্ধী বিনাশর্তে মুক্তি পেলেন। জিন্না পাঞ্জাবে পরাজয় বরণ করেন। জিন্না হল এবং কংগ্রেস হাউজ দুটো না পরাজিত হলো, না মুক্তি পেলো। ওদের ওপর সরকারের এবং সামান্য দূরে অবস্থিত মুতরীটির ওপর দুর্গন্ধের কব্জা পুরোদস্তর চলতেই থাকে। আশেপাশের মহল্লার বিভিন্ন ময়লা-আবর্জনা স্তূপাকারে বাইরে জমতেই থাকে।

তৃতীয়বার আবারো তাকে সেই মুতরীতে যেতে হলো—পেচ্ছাব করতে। নাকে রুমাল রেখে, শ্বাস বন্ধ করে সেই ময়লা আবর্জনার কুঠরীতে প্রবেশ করলো। মেঝেতে ময়লা পোকা কিলবিল করছিলো। দেয়ালগুলোতে মানুষের লজ্জাস্থানের নকশা আঁকার জন্যে আর কোন জায়গা খালি নেই। ‘মুসলমানো কি বহেন কা পাকিস্তান মারা’ ‘হিন্দুও কি মা কা অখণ্ড হিন্দুস্থান মারা’ লেখাগুলো প্রায় অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। কিন্তু সেই লেখাগুলোর নীচে সাদা মাটি দিয়ে লিখিত কথা ক’টি বড় স্পষ্ট আকারে জ্বলজ্বল করছিলো—‘দুনো কিমা কা হিন্দুস্থান মারা’।

এই লেখাটা মুহূর্তের জন্যে যেন মুতরীর যাবতীয় দুর্গন্ধ দূর করে দেয়। সে যখন আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসছিল, তখন তার কাছে মনে হলো যেন দুর্গন্ধের এই ঘর এক অজানা সুগন্ধে ভরে গেছে, স্রেফ এক মুহূর্তের জন্যে!

◆

পটভূমি

'আজকের টাটকা খবর শুনেছেন আপনি ?'

'কোরিয়ার ?'

'জী না।'

'বেগম জুনাগড়ের ?'

'জী না।'

'হত্যা-লুটপাটের, কোন নতুন দুর্ঘটনার ?'

'সা'দত হাসান মান্টোর।'

'কেন—মরে গেছে ?'

'জী না, কালকেই গ্রেফতার হয়েছে।'

'অশ্লীলতার অভিযোগ ?'

'জী হ্যাঁ, পুলিশ ওর খানা তল্লাশী করেছে।'

'কোকেন অথবা চোরাই পথের মদ-টদ পাওয়া গেছে ?'

'না। পত্রিকায় লিখেছে, তার বাড়ী থেকে কোন বেআইনী মালামাল পাওয়া যায়নি।'

'কিন্তু ওর খোদ অস্তিত্বটাই বেআইনী।'

'জী হ্যাঁ, কম সে কম সরকার তো তাই মনে করে।'

'তা তাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করা হলো না কেন ?'

'বহিষ্কার, পুনর্বাসন সবকিছু সরকারের হাতে। যাকে ইচ্ছা সরকার দেশ থেকে বহিষ্কার করতে পারে, যাকে ইচ্ছা সরকার আবার পুনর্বাসনও করতে পারে। সত্যি বলতে কি, এ কাজ সরকারের হাতে থাকাই ভালো। সরকারই এর মর্ম জানে।'

'এতে আর সন্দেহ কি !'

'তা আপনার কি মনে হয় ? এবার তো মান্টোর সাজা ফাঁসি হওয়া চাই।'

'হলে তো ভালো। স্থায়ী কাঁটা দূর হয়।'

'আপনি ঠিকই বলেছেন! 'ঠাণ্ডা গোস্তে'র ব্যাপারে হাইকোর্ট তার বিরুদ্ধে যে রায় দিয়েছে এরপর তো হতভাগার নিজে মরে যাওয়া ভালো ছিলো। অর্থাৎ, আমি বলতে চাচ্ছি, আত্মহত্যা করা উচিত ছিলো।'

'যদি আত্মহত্যার চেষ্টা করে বিফল হতো?'

'তাহলে তো তার ওপর সত্যি সত্যি মকদ্দমা চলতো যে, সে নিজের প্রাণ দেয়ার চেষ্টা করেছিলো।'

'আমার মনে হয় এজন্যেই সে আত্মহত্যা করেনি। তা না হলে 'না' করার মতো লোকই না সে।'

'তাহলে আপনি বলতে চান সে তার অশ্লীলতা চালু রাখবেই?'

'জী হ্যাঁ, এটা তার বিরুদ্ধে পঞ্চম মকদ্দমা। চালু না রাখলে তো প্রথম মকদ্দমার পরই সে তওবা করে কোন ভদ্র কাজ-কাম শুরু করে দিতো।'

'উদাহরণ স্বরূপ, সরকারী চাকুরী নিয়ে নিতো। ঘি বিক্রি করতো, অথবা পীর গিলানীয়া মহল্লার গোলাম আহম্মদ সাহেবের মতো কোন ওষুধ আবিষ্কার করে ফেলতো।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, এরকম হাজার হাজার ভদ্র পেশা আছে। কিন্তু সে তো জেদী নাম্বার ওয়ান, লিখবে এবং লিখবেই।'

'কিন্তু আপনি জানেন, এর পরিণতি কি হবে?'

'কিছুটা খারাপই দেখা যাচ্ছে।'

'পাঞ্জাবে তার বিরুদ্ধে ছ'টা মকদ্দমা চলছে। দশটা সিন্ধু প্রদেশে, চারটা মকদ্দমা সীমান্ত প্রদেশে, তিনটা পূর্ব পাকিস্তানে।—এর একটার আঁচ সহ্য করতে না করতেই সে পাগল হয়ে যাবে।'

'দু'বার তো পাগল হয়েই সেরেছে।'

'এটা তার দূরদর্শিতা। রিহার্সাল করে নিলো আর কি। সত্যি সত্যি যখন পাগল হবে তখন যেন পাগলা গারদে আরামে থাকতে পারে।'

'পাগল হয়ে কি করবে?'

'পাগলদের জ্ঞান ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করবে।'

'এটাও মারাত্মক অপরাধ।'

'জানি না। এটা কোন উকিলই ভালো বলতে পারবে যে, পাকিস্তান দণ্ডবিধি মোতাবেক এর জন্যে কোন দফা আছে কি নেই।'

'থাকা উচিত। পাগলদের জ্ঞান ফিরিয়ে আনা ২৯২ ধারা মোতাবেক মারাত্মক অপরাধ মনে হয়।'

'২৯২ ধারার ব্যাপারে তো 'ঠাণ্ডা গোস্তের' রায় দিতে হাইকোর্ট পরিষ্কার বলে দিয়েছে যে, লেখকের উদ্দেশ্যের সাথে আইনের কোন সম্পর্ক নেই। খারাপ হোক, কি ভালো হোক, আইন শুধু দেখবে লেখকের উদ্দেশ্যটা কি।'

'এ জন্যেই তো আমি বলছি পাগলদের জ্ঞান ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে উদ্দেশ্য যাই থাকুক, সে উদ্দেশ্যের দিকে খেয়াল রাখতে হবে। এবং এটা সত্য কথা যে, সে উদ্দেশ্য ক্ষতিকারক নয় তা কোন রকমেই বলা যায় না।'

'এসব আইনের খুঁটিনাটি দিক থেকে আমাদের দূরে থাকা উচিত।'

'সময় মত সাবধান করে দিয়ে আপনি ভালোই করেছেন। কারণ এসব ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করাই মস্তবড় অপরাধ।'

'কিন্তু জনাব, আমি ভাবছি মান্টো যদি সত্যি সত্যি পাগল হয়ে যায়, তাহলে তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের কি হবে?'

'তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা জাহান্নামে যাক! আইনের সাথে তার কি সম্পর্ক?'

'তা ঠিক। কিন্তু সরকার কি ওদের কোন সাহায্য করবে না?'

'হ্যাঁ, সরকার—সরকারের কথাই আলাদা। আমার মতে, তাদের সাহায্য করা উচিত।'

'আর কিছু না হোক অন্ততঃ পত্রিকায় ঘোষণা করা উচিত—সরকার ওদের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করছে।'

'চিন্তা-ভাবনা করা শুরু করলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

'গজব পড়ুক মান্টো আর তার স্ত্রী ও ছেলেপেলের ওপর! আপনি আগে বলুন, হাইকোর্টের রায়ে উর্দু সাহিত্যের ওপর কোন প্রভাব পড়বে না তো!'

'উর্দু সাহিত্যের ওপরও গজব পড়ুক!'

'না সাহেব, ওভাবে বলবেন না। শুনেছি, সাহিত্য জাতির মস্তবড় পুঁজি।'

'হবে হয়তো। আরে ভাই আমরা পুঁজি বলি যেটা ব্যাঙ্কে নগদ পড়ে আছে।'

'লাখ লাখ টাকার কথা বলছেন আপনি? তাহলে মু'মেন, মীর, আহসান, জওক, সাদী, হাফিজ প্রমুখদেরও ২৯২ ধারা মতে শেষ করে দেবে!'

'দেয়া তো উচিত। তা না হলে ওদের অস্তিত্বের মানেটাই বা কি?'

'এই যে একরাশ সাহিত্যিক আর কবি পথে-ঘাটে ঘুরছে, এখন ওদের উচিত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়া এবং কোন ভদ্র পেশায় নিজেদের নিয়োজিত করা।'

'লিডার হয়ে যাক।'

'তাও স্রেফ মুসলিম লীগের।'

'জী হ্যাঁ, আমার আসল কথাও তাই। অন্য কোন পার্টির লিডার হওয়াটাই অশ্লীলতা, বড় বেহায়াপনা।'

'ভয়ানক বেহায়াপনা।'

'লিডারী ছাড়াও দেশে আরো অনেক ভদ্র পেশা আছে। পোষ্ট-অফিসের বাইরে বসে পবিত্র শিরোনামায় 'চিঠি লেখালেখির' কাজ করুক। দেয়ালে দেয়ালে পোষ্টার লিখুক। বেকার-অফিসের কেরানী হয়ে যাক। নতুন দেশ হাজার হাজার জায়গা খালি পড়ে আছে। কোথাও গিয়ে জড়িয়ে পড়লেই হয়।'

'জী হ্যাঁ, কত কত খালি জায়গা পড়ে আছে।'

'বাঈজী আর বেশ্যাদের জন্যে সরকার রাভী নদীর কাছে একটা বস্তী তৈরী করার কথা ভাবছে, যাতে শহরের যাবতীয় ময়লা-আবর্জনা দূর হয়। এসব কবি, গাল্পিক আর সাহিত্যিকদেরও ওদের সাথে দিয়ে দিলেই পারে!'

'আপনার পরামর্শটা ভালোই। এসব লোকেরা ওখানেই সুখে থাকবে।'

'কিন্তু তার পরিণতি ?'

'পরিণতির কথা কে ভাবে ? যা হবার হবেই।'

'খামাখা এখানে ওখানে পড়ে ভুল করছে। লোহা লোহা কাটে, অশ্লীলতাকে অশ্লীলতাই শেষ করবে।'

'ব্যাপারটা বড়ই চিত্তাকর্ষক হবে।'

'বিশেষ করে মাণ্টো তো ওখানে নিজের জন্যে বেশ আকর্ষণীয় মালমশলা পেয়ে যাবে।'

'কিন্তু ও হতভাগা তো বেশ্যাদের নাচ-গান শোনার পরিবর্তে ওদের নিয়ে লেখা শুরু করে দেবে। আরো কিছু 'সৌগন্ধি,' কিছু 'সুলতানা'-কে পেশ করবে।'

'কিছু খুশী, কিছু অনুসন্ধান।'

'জানি না কাদায় ডুবে-থাকা মানুষগুলোকে ওপরে তুলে এনে কি মজা পায় হতভাগাটা! পৃথিবী শুদ্ধ ওদের নীচ, হীন মনে করে, কিন্তু সে ওদের বুকে তুলে নেয়, ভালোবাসে।'

'তার বোন ইসমত তার সম্পর্কে কিছু কথা বলেছে, বড় হাসির কথা। এ জাতীয় লোকদের পেট থেকে ভালো কিছু বের করার চেষ্টা করাটাই বরং আরেক অশ্লীলতা। কারণ এদের পেট থেকে কিছু নোংরা নাড়িভূড়ি আর ময়লা আবর্জনা ছাড়া আর কিছুই বের হবে না।'

'এবং পেট কাটলেই সেই ময়লা আবর্জনার একটা সাদা পর্দা মানুষের ওপর লাফিয়ে পড়বে।'

'এটা আরো বিশ্রী, আরো অশ্লীলতা।'

'লোকটা এতো ময়লা আবর্জনা নিয়ে আসে কোত্থেকে ?'

'জানি না, কোথাও না কোথাও থেকে খুঁজে বের করে আর কি।'

'ডুবুরীর মতো ময়লা আবর্জনা খুঁজে ফেরে।'

'আসুন, আমরা প্রার্থনা করি যেন তার অভিশপ্ত অস্তিত্ব থেকে খোদা আমাদের রক্ষা করেন।'

'স্বয়ং মাণ্টোর নিষ্কৃতিও এর মধ্যে নিহিত।'

'তাতে আর সন্দেহ কি ?'

'হে খোদা! হে রাব্বুল আলামিন! হে রহিম! হে করিম! আমরা দু'জন গুনাহগার বান্দা তোমার কাছে গড় হয়ে প্রার্থনা করছি যে, তুমি সা'দত হাসান মান্টোকে—যার পিতার নাম গোলাম হাসান মান্টো এবং যিনি খুবই ভদ্র অমায়িক আর ধার্মিক—এই পৃথিবী থেকে উঠিয়ে নিয়ে যাও। এখানে সে সুগন্ধ ছেড়ে কেবল দুর্গন্ধের দিকে ছুটে বেড়ায়। আলোর সামনে সে চোখও খোলে না, কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে পথ হাতড়ে বেড়ায়। পূত-পবিত্রতার প্রতি কোন আকর্ষণ বোধ করে না সে। শুধু মানুষের দোষত্রুটি খুঁজে বেড়ায়। মিষ্টির প্রতি তার কোন লোভ নেই, কিন্তু তেতো ঠোঁটের জন্যে জান দিয়ে দেয়। ঘরোয়া ভদ্র মেয়েদের দিকে চোখ তুলেও তাকায় না, কিন্তু বেশ্যা মাগীদের সঙ্গে যত্রতত্র খোশ-গল্পে মেতে ওঠে। আয়নার মতো পরিষ্কার পানি ছেড়ে ময়লা অপবিত্র পানিতে স্নান করে। যেখানে কাঁদতে হবে সেখানে সে হাসে, যেখানে হাসতে হবে সেখানে সে কাঁদে। কয়লা সাফ করে সে কয়লা থেকে কালিমা দূর করে। তোমার পিছে না গিয়ে শয়তানের পিছে ধাওয়া করে, সে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে।'

'হে রাব্বুল আলামিন! এই পাপীষ্ঠ একরাশ ময়লা আবর্জনার ভেতর ডুবে-থাকা নরাধমকে এই পৃথিবী থেকে তুলে নাও—যেখানে সে চরিত্রহীন আর দুর্বিনীত লোকজনদের অশ্লীল কার্যাবলী সম্বলিত সব কলঙ্ক দূর করে দেয়ার চেষ্টায় নিয়োজিত। হে খোদা! সে পাপকে বড় ভালোবাসে। আদালতের রায়ই তার প্রমাণ। কিন্তু এটা পৃথিবীর আদালত। তুমি ওকে এই পৃথিবী থেকে তুলে নিয়ে যাও এবং নিজের আসমানী আদালতে ওর বিরুদ্ধে মামলা চালাও এবং উপযুক্ত শাস্তি দাও। কিন্তু সে বিভিন্ন ছল-চাতুরীতে বড় সিদ্ধহস্ত—তার কোন ছল-চাতুরীতে না আবার মজে যাও! তবে তুমি সবকিছুই জান। প্রার্থনা স্রেফ এটুকুনই, সে যেন এই পৃথিবীতে আর না থাকে। যদি থাকেও, যেন আমাদের মতো থাকে—যে রকম আমরা পরস্পর পরস্পরের পাপ-কলঙ্কের ওপর পর্দা ঢেকে দিই।'

—সমাপ্ত—